নিমাই পণ্ডিতের গল্প

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, বি. এ.

মূল্য ১৲ টাকা

প্রকাশক

বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিঃ

স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী

৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ;

৩৮ পাটুয়াটুলী, ঢাকা

১৩৪৪

কলিকাতা

৫নং কলেজ স্কোয়ার

শ্রীনারসিংহ প্রেসে

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত

উপহার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজনপ্রিয় ভাইস্ চ্যান্সেলর্—ক্লান্তিহীন কর্মবীর

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্. এ ; বি. এল,

ব্যারিষ্টার্-য়্যাট্-ল, মহোদয়ের

করপদ্মে—

তুমি

বাণীর কমল-বনে প্রস্ফুট প্রসূন
বঙ্গের ললাট-শোভা। বিস্তৃত বিশাল
জ্ঞান-পারাবার মাঝে তুমি সুনিপুণ
শিক্ষাতরী-কর্ণধার। ধরিয়াছ হাল
বিক্ষোভ-আবর্তময় উত্তালতরঙ্গে।
তুচ্ছ করি' শত বাধা, উপেক্ষি' সংশয়,
নাহি মানি' বিপক্ষের কুটীল ভ্রূভঙ্গে
সঙ্কল্প-বিজয়-পথে চলেছ নির্ভয়।
প্রতিষ্ঠিয়া মাতৃভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে
ফুটায়ে তুলিলে ভাষা বঙ্গবাসী-প্রাণে
জাগায়ে অনন্ত আশা। বাণীর নিলয়ে
ধ্বনিবে এ কীর্তি তব নব নব গানে।
সুযোগ্য পিতার তুমি যোগ্যতম সুত,
আমার প্রণতি লহ হৃদিশ্রদ্ধাপূত।

বিনয়াবনত

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

যে মহাপুরুষের আবির্ভাবে বাংলায় এক নবযুগের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এক নতুন ভাবের বন্যা সারা দেশ প্লাবিত করেছিল, সেই নিমাই পণ্ডিতের জীবনের বৈচিত্র্যময় ঘটনাগুলি অবলম্বনেই এই গল্পগুলি রচিত। এর উপাদান শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, মহাত্মা শিশিরকুমারের অমিয়নিমাইচরিত ও অধ্যাপক ৺সতীশচন্দ্র মিত্রের সপ্ত-গোস্বামী প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। এই শ্যামল বাংলার বুকে "বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া" যে নিমাই কায়া ধারণ করেছিলেন, তাঁর এই মধুর কাহিনীগুলি যদি মুখ্যত বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়, তা হ'লেই এই প্রয়াস সার্থক।

আশুতোষ লাইব্রেরীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী ও "শিশুসাথী"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধর মহাশয়ের উৎসাহ এবং আমার কনিষ্ঠ সহোদর-তুল্য স্নেহভাজন সুকবি শ্রীমান গোপালচন্দ্র দাসের সহায়তা আজ বার বার মনে জাগে। ইতি—

চুঁচুড়া
আষাঢ়, ১৩৪৪ সাল

বিনীত
শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি'
আকাশে প্রদীপ জ্বালি।
আমাদেরি এই কুটীরে দেখেছি
মানুষের ঠাকুরালি।
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি
বিশ্বভূপের ছায়া ;
বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া
নিমাই ধরেছে কায়া।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সূচীপত্র

নিমাইর সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বমুহূর্ত্তের দৃশ্য—১২৮ পৃষ্ঠা

নিমাই পণ্ডিতের গল্প

দিগ্বিজয়ীর পরাজয়

নবদ্বীপে খুব সোরগোল প'ড়ে গেছে।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এসেছেন। নাম তাঁর কেশব; কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ। সব চেয়ে বেশী তাঁর হাঁক-ডাক। চাল-চলন রাজার মত—সঙ্গে হাতী, ঘোড়া, লোকজন।

উত্তর-ভারতের এমন কোন নামজাদা পণ্ডিত নেই যিনি তর্কে তাঁর কাছে পরাজিত হন নি। কার সাধ্য তাঁর সামনে দাঁড়ায়? এখন নবদ্বীপের পণ্ডিতদের হারাতে পারলেই তাঁর দিগ্বিজয় পূর্ণ হয়।

নবদ্বীপে এসেই পণ্ডিত কেশব ঘোষণা করলেন—"যদি কোন সাহসী পণ্ডিত থাকেন তিনি এসে আমার সঙ্গে বিচার করুন, না হয়

নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ আমাকে জয়পত্র লিখে দিন্। আর এক কথা, আমি জিতলে আমাকে উপহার দিতে হবে, আর যদি আমিই হারি, আমার সমস্ত সম্পত্তি নবদ্বীপের অধিবাসীরা পাবেন।”

এদিকে গুজব রটে গেল যে, কেশব পণ্ডিতের জিহ্বায় সরস্বতী ব'সে আছেন, তাঁর সঙ্গে বিচার করাও যা, স্বয়ং সরস্বতীর সঙ্গে বিচার করাও তা। মানুষের সঙ্গে তর্ক ক'রে পারা যায়, কিন্তু সরস্বতীর সঙ্গে তর্ক ক'রে পারবে কে? কাজেই নবদ্বীপের মহা মহা পণ্ডিতের মুখ ভয়ে একেবারে এতটুকু হ'য়ে গেল।

তরুণ পণ্ডিতদের মধ্যে তখন রঘুনাথ, রঘুনন্দন আর নিমাই পণ্ডিত সব চেয়ে বেশী নামজাদা। ভরসা এখন এঁরাই, তা নইলে নবদ্বীপের গৌরব ত যায় যায়। তর্ক-যুদ্ধে নিমাই সকলের সেরা, যদিও বয়সে তিনি নিতান্তই ছেলেমানুষ। বড় পণ্ডিতেরাও তাঁকে ভয় ক'রে চলতেন। কাউকে তর্কে তিনি রেহাই দিতেন না, কেউ পেরেও উঠতেন না।

কয়েকজন পণ্ডিত পরামর্শ ক'রে স্থির করলেন যে, নিমাইকে দিয়ে কেশব পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করাবেন; নিমাই হেরে গেলে নবদ্বীপে আর কেউ জিতবেন না।

একদিন নিমাই পণ্ডিত সন্ধ্যার সময় গঙ্গার তীরে ব'সে আছেন। ছাত্ররা তাঁর চারদিক ঘিরে ব'সেছেন। আকাশ থেকে সবেমাত্র চাঁদের রূপালি আলো এসে প'ড়েছে গঙ্গার চঞ্চল বুকের ওপর।

ছাত্রদের সঙ্গে নিমাই একমনে শাস্ত্রের আলাপ কচ্ছেন। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক লোক এসে শুনতে লাগল।

ঠিক এমন সময়েই কেশব পণ্ডিত সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

এতগুলি ছাত্র দেখে তাঁর সন্দেহ হ'ল। নিমাই পণ্ডিতের কথা নবদ্বীপে এসে অনেকের কাছেই শুনেছেন। ভাবলেন এই ছোকরা পণ্ডিতই বোধ হয় নিমাই। সঙ্গের লোক দিয়ে খবর নিয়ে জানলেন তাঁর অনুমান সত্য। তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে নিমাইয়ের সামনে এসে উপস্থিত হ'লেন।

শিষ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে মহা সমাদরে নিমাই পণ্ডিত তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।

কেশব বললেন—"তুমিই নিমাই পণ্ডিত? তুমি ত নিতান্ত বালক, তা হ'লেও তোমার কথা শুনেছি। তুমি ব্যাকরণ পড়াও, না?"

নিমাই উত্তর করলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ। ব্যাকরণ পড়ানো আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র, আমি নিজেও বিশেষ কিছু বুঝি না, আমার শিষ্যেরাও বোঝে না। আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার মত অদ্বিতীয় পণ্ডিতের দর্শন পেলুম। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রেই অদ্বিতীয়, আপনি দিগ্বিজয়ী।"

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কথা কইলেন না।

নিমাই বললেন—"যদি দয়া ক'রে দর্শনই দিলেন তবে একটা নিবেদন শুনুন।"

—"কি নিবেদন বল।"

নিমাই বললেন—"সামনেই গঙ্গা, আপনি একটি গঙ্গাস্তব রচনা ক'রে শোনান। শুনে আনন্দও পা'ব, পাপও দূর হবে।"

"তা বেশ, আমি এখুনি রচনা ক'রে শোনাচ্ছি।"—এই ব'লেই কেশব স্তব পড়তে লাগলেন। এক একটা চার লাইনের বড় বড় শ্লোক; একটা শেষ হয়, অমনি আর একটা আরম্ভ করেন।

সকলে স্তম্ভিত। মানুষের দ্বারাও কি এ সম্ভব? একটু ভাবতে হচ্ছে না, অথচ অনর্গল শ্লোকের পর শ্লোক মুহূর্ত্তের মধ্যে রচনা ও আবৃত্তি করা সরস্বতীর পক্ষে হয়তো সম্ভব, কিন্তু মানুষের পক্ষে সম্ভব হ'ল কি ক'রে? ছাত্ররা ভাবতে লাগলেন এমন পণ্ডিতের সঙ্গে বিচারে জয়লাভ অসম্ভব। তাঁদের ভয় হ'ল হয়তো নিমাই এবার পরাজিত হবেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের যতটা সম্ভব প্রশংসা ক'রে নিমাই বললেন—"আপনার মত মহাকবি জগতে খুবই দুর্লভ। আপনার কাছে এখন একটা নিবেদন জানাতে চাই।"

—"বেশ, বল।"

নিমাই বললেন—"আপনার স্তবটির একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করুন।"

—"কোন্ শ্লোকটি বল।"

নিমাই স্তবটির মাঝখান থেকে চার লাইনের একটি শ্লোক মুখস্থ বললেন।

এবার দিগ্বিজয়ীরও একটু তাক লাগল; ভাবলেন, একবার মাত্র শুনে অত বড় একটা স্তোত্র মুখস্থ রাখা ত সাধারণ মানুষের কর্ম্ম নয়। নিমাই বালক বটে, কিন্তু ওর শক্তি ত মোটেই সাধারণ নয়। তারপর দিগ্বিজয়ী প্রকাশ্যে বললেন—"নিমাই, বল ত কি ক'রে তুমি এত বড় স্তোত্র একবার শুনেই মুখস্থ ক'রে ফেললে? আমি ত ঝড়ের মত দ্রুত আবৃত্তি ক'রে গেছি।"

নিমাই হেসে বললেন—"দেখুন সরস্বতীর দয়ায় কেউ হন কবি, আবার তাঁরই দয়ায় কেউ বা হন শ্রুতিধর।"

জবাবটা শুনে দিগ্বিজয়ী মনে করলেন নিমাই নিশ্চয়ই শ্রুতিধর। মনে মনে নিমাইয়ের ওপর তাঁর একটু শ্রদ্ধাও হ'ল।

তিনি শ্লোকটির ব্যাখ্যা করলেন।

নিমাই বললেন—"আপনার ব্যাখ্যা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হ'য়েছি। এখন যদি দয়া ক'রে শ্লোকটিতে কি কি দোষ ঘটেছে তাই বলেন ত কৃতার্থ হই।"

এই প্রশ্নে যে দিগ্বিজয়ী মোটেই সন্তুষ্ট হন নি তা না বললেও চলে। তিনি বললেন—"নিমাই, তুমি ত শুধু ব্যাকরণের পণ্ডিত, অন্য কোন শাস্ত্রে ত তোমার জ্ঞান নেই, কাব্য ত বিশেষ পড় নি, তাই বুঝতে পাচ্ছ না যে কবিতাটি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

নিমাই উত্তরে বললেন—"কবিতাটি নির্দ্দোষ বলছেন বটে, কিন্তু যদি দুঃখিত না হন, তবে আমি দেখিয়ে দিতে পারি যে, আপনার শ্লোকে কাব্যের যেমন পাঁচটি গুণ আছে, তেমনি পাঁচটি মারাত্মক দোষ বা ভুলও আছে।"

দিগ্বিজয়ী বললেন—"বেশ ত, তোমার বিদ্যাবুদ্ধি যা আছে একবার জাহিরই কর।"

নিমাই তখন একে একে পাঁচটি দোষ বের ক'রে কাব্যশাস্ত্রের নিয়ম মত ব্যাখ্যা করলেন।

দিগ্বিজয়ী নির্ব্বাক্। তাঁর ভুল তিনি বুঝতে পারলেন, সুতরাং আর তর্ক করলেন না, নিমাইয়ের অদ্ভুত বিচারশক্তি দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। নানা দেশের বড় বড় পণ্ডিতকে যিনি অনায়াসে হারিয়ে দিয়ে এসেছেন, তিনি কিনা শেষে হেরে গেলেন ব্যাকরণের এক ছোকরা পণ্ডিতের কাছে, তাও অতগুলো লোকের মাঝখানে! লজ্জা ও অপমানে তাঁর বুদ্ধি লোপ পেল।

তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে নিমাই সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

"ভগবানের অনুগ্রহ ছাড়া কেউ কবিত্বশক্তি পায় না, আপনি তা প্রচুর পেয়েছেন। জগতে এমন কোন কবি আছেন যাঁর রচনায় কোনখানে না কোনখানে দোষ নেই? আপনার লজ্জা বা দুঃখের কিছুমাত্র কারণ নেই। আজ রাত্রি বেশী হ'য়েছে, এখন গিয়ে বিশ্রাম করুন।"

বাসায় ফিরে গিয়ে কেশব বিশ্রাম করতে পারলেন না, সমস্ত রাত জেগেই কাটালেন। অতি প্রত্যুষেই তিনি ছুটে এলেন নিমাইয়ের বাড়ীতে। নিমাই ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই কেশব পড়লেন তাঁর পায়ে। নিমাই তাড়াতাড়ি তাঁকে ধ'রে তুলে বললেন—"আমি বালক, আপনি মহাপণ্ডিত, আপনার এ কি হ'ল?"

কেশবের দু' চোখ দিয়ে তখন ঝর ঝর ক'রে জল পড়ছে। নিমাইয়ের সঙ্গে দু'চারটি কথার পর তিনি বাসায় ফিরে এলেন। তারপর তাঁর সমস্ত ধনসম্পত্তি নবদ্বীপবাসীদের মধ্যে বিতরণ করলেন, এবং আর একটুও বিলম্ব না ক'রে সন্ন্যাসীর বেশে জন্মের মত সংসার ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন।

শিশুর দৌরাত্ম্য

নিমাইয়ের হাতে-খড়ি হ'য়ে গেছে, কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁর মন নেই, খালি খেলা আর দুষ্টুমি। সমান বয়সের ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া আর মারামারি কথায় কথায় লেগেই আছে। মাকে মোটেই ভয় পান না, বাবাকে একটু একটু ভয় ক'রে চলেন। কোন সময়ে লাঠি নিয়ে বাবা তাড়া করেন বটে, কিন্তু মারতে পারেন না—তাঁর কাণ্ড-কারখানা দেখে।

শচীদেবীর একটু শুচিবাই ছিল, তাই নিমাই তাঁকে সব সময়েই ভয়ানক জ্বালাতন করতেন; যা ছুঁলে দোষ, শচীদেবী দেখতে পান এমনি ভাবে তা ছুঁয়ে দিতেন। এই রকম দুষ্টুমির মধ্যেও এমন সব কথা মাঝে মাঝে বলতেন যে, সে সব শুনে মা অনেক সময়েই বিস্মিত হ'য়ে যেতেন; মনে করতেন নিমাই যেন মস্ত বিজ্ঞলোকের মত তাঁকে উপদেশ দিচ্ছেন।

শচীদেবী নিমাইয়ের মুখের দিকে নিমেষহারা হ'য়ে চেয়ে থাকতে বড় ভালবাসতেন। যেমনি তিনি চেয়ে থাকতেন অমনি নিমাই পেছু ফিরে দাঁড়াতেন। তিনি ধীরে ধীরে আবার আগে গিয়ে দাঁড়াতেন, নিমাইও অমনি আবার ফিরে দাঁড়াতেন। ক্রমাগত এমনি করায় মা রাগ করতেন।

নিমাইয়ের কথা বড়ই মধুর, শচীদেবীর কানে যেন অমৃত ঢেলে দেয়। তাই তিনি তাঁর কথা শুনতে বড়ই ভালবাসতেন। কিন্তু নিমাইও এমন দুষ্টু যে, ইচ্ছা ক'রেই মার সঙ্গে কথা কওয়া মাঝে বন্ধ ক'রে দিতেন। যেমনি বুঝতে পারলেন মা তাঁর কথা চান, অমনি চুপ। কথা কওয়াবার জন্য মা খোসামোদ করতেন, ভয় দেখাতেন, শেষে রেগে ধরতে যেতেন, নিমাইও অমনি লম্বা দৌড় মারতেন, না হয় তো আস্তাকুঁড়ে গিয়ে দাঁড়াতেন। মা ত আর সেখানে যেতে পারতেন না!

একদিন নিমাই ভয়ানক কান্না সুরু ক'রে দিলেন। তাঁর কান্নার হরিনাম করলেই কান্না বন্ধ হ'ত। কিন্তু সেদিন কিছুতেই কিছু হ'ল না, তাঁর কান্না সমানে চলতে লাগল।

মা অত্যন্ত কাতর ভাবে তাঁকে বললেন—"বাবা, যা চাও পাবি ত তা-ই দেবো, তুমি আর কেঁদ না, তোমার কান্না যে আর সইতে পারি না।"

জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীর পাশে জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্যভাগবত নামে দুই ব্রাহ্মণের বাড়ী ছিল। নিমাই বললেন—"জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্যভাগবতের বাড়ী যে একাদশীর নৈবেদ্য আছে তা যদি খেতে পাই তবে আর কাঁদব না।"

সেদিন ছিল একাদশী। মা তাঁর কথা শুনে জিভ কেটে বললেন—"ছি বাবা, ঠাকুরের জিনিষ অমন ক'রে চাইতে নেই। আমি তোমাকে বাজার থেকে নৈবেদ্যের জিনিষ আনিয়ে দেবো।"

নিমাই বললেন—"তা হবে না মা, ঐ দুই ব্রাহ্মণের নৈবেদ্যই চাই।"

"—তোমার বিদ্যাবুদ্ধি যা আছে একবার জাহির‌ই কর

[৫ পৃষ্ঠা]

মহা বিপদ! নিমাইয়ের কান্না আর থামে না। এ কথাটা একটু কালের মধ্যেই ঐ দুই ব্রাহ্মণের কানে গেল। তাঁরা রহস্য দেখবার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। নিমাইকে দেখে তাঁরা ভাবলেন, এতটুকু ছেলে কি ক'রে বুঝলে আজ একাদশী। হ'তে পারে ভগবানেরই ইচ্ছা এই শিশুর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। এমন গায়ের রং, এমন সুন্দর নাক মুখ চোখ ত কারোও কোনও দিন দেখি নি।

তাঁরা নিমাইয়ের সামনে গিয়ে বললেন—"বাবা, তুমি খেলেই ঠাকুরের খাওয়া হবে। নৈবেদ্য এনে দিচ্ছি।"

নৈবেদ্য পেয়ে নিমাই ত মহাখুসী। কতক নিজে খেলেন, কতক মাটিতে ছড়িয়ে ফেললেন, কতক বিলিয়ে দিলেন, আর খানিকটা নিজের গায়ে মেখে ব'সে রইলেন।

শচীদেবী ভাবতে লাগলেন ছেলেটা একেবারেই ক্ষেপা হ'ল। কোন্ পাপে তাঁর এই চাঁদপানা ছেলে এমন ক্ষেপা! কি করবেন কিছুই স্থির করতে না পেরে নিজের ভগ্নীকে ডেকে এনে সব বললেন। সব শুনে তাঁর ভগ্নী বললেন—"তোমাদের পাড়া থেকে দু'চার জন বিজ্ঞ গৃহিণীকে ডেকে আনা যাক্। দেখি তাঁরা কি বলেন।"

পাড়ার দু'চার জন বিজ্ঞ গৃহিণী এসে বসলেন। তাঁরা সকলেই বড় বড় পণ্ডিতের স্ত্রী। নিজেরা লেখাপড়া জানুন আর নাই জানুন, তেমন কিছু বুঝুন আর নাই বুঝুন, দিনরাত্রি শাস্ত্রালাপ শোনেন, বড় বড় পণ্ডিতে পণ্ডিতে নানা বিষয় নিয়ে হরদম তর্ক-বিতর্ক হয়, আড়াল থেকে তাও শোনেন; সুতরাং তাঁরা নিজেরাও যে কিছু বোঝেন না, কিংবা তাঁদের জ্ঞান কম, এ ধারণা তাঁদের না হওয়াই স্বাভাবিক।

শচীদেবী তাঁদের কাছে একে একে নিজের দুঃখের কাহিনী বলতে লাগলেন—"জান তো ভাই, আমার কতগুলো সন্তানকে একে একে যমের মুখে দিয়েছি। তার জন্য দুঃখ ক'রে আর কি করব! এখন নিমাইকে নিয়ে যে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছি। ছেলেটার বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ আছে, দয়ামায়াও খুব আছে; ঘরের হাঁড়িগুলো ভেঙে চুরমার ক'রেছে তাতেও দুঃখ বোধ করি নি; কিন্তু দেবতা মানে না, পুজোর জন্যে জিনিষ কিনে আনলে খেতে চায়, উচ্ছিষ্ট ত একেবারেই মানে না, মুচিকে ছুঁয়ে দেয়। বারণ করলে বলে, 'আমি ছুঁয়ে দিলে মুচি শুচি হয়।' বলত ও এমন হ'ল কেন?"

পাড়ার গৃহিণীরা শুনে গম্ভীর ভাবে রায় দিলেন—"দেখ ভাই, এ নিশ্চয়ই অপদেবতার কাণ্ড। তা নইলে এমনটি হ'তেই পারে না।"

ঠিক এই সময়ই সেখানে নিমাই এসে উপস্থিত। তাঁকে দেখে পাড়ার এক বয়স্কা গৃহিণী বললেন—"নিমাই, তোমার এসব কি কাণ্ড বল ত? তোমার বাপ অতবড় একটা পণ্ডিত, তুমি এমন সৎ-ব্রাহ্মণের ছেলে, আর তুমিই ঠাকুর-দেবতা মান না?"

নিমাই অমনি মুখ ভেঙচে বললেন—"ঠাকুর-দেবতা মানতে যা'ব কিসের জন্য? আমিই ত দেবতা।"

শচীদেবী অমনি বলে উঠলেন—"ঐ শোন কি বলে। কি সর্ব্বনাশ হবে বল ত। দেবতাদের সম্বন্ধে এসব কথা শুনে আমার প্রাণ শুকিয়ে যায়।"

তখনই উর্দ্ধদিকে চেয়ে দু'হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে তিনি বললেন—"ঠাকুর, আমার ক্ষেপা ছেলে কি বলে ঠিক নেই, তার অপরাধ

নিও না ঠাকুর।" এই কথা বলতে বলতেই তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

পাড়ার গৃহিণীরা তখন খুব গম্ভীর ভাবে বললেন—"যা ব'লেছি ভাই, তা কি মিথ্যে হয়? এ নিশ্চয়ই অপদেবতার কর্ম্ম। খুব ভাল ক'রে একটি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করতে হবে, আর ষষ্ঠীদেবীকে পূজো দিতে হবে। এ ছাড়া আর কোনও উপায় দেখছি না।"

এই উপদেশ পেয়ে শচীদেবী পূজোর আয়োজন করলেন, কিন্তু তাঁর মনে এই ভয় রইল যে, নিমাই যদি জানতে পারেন ত নৈবেদ্যের সব জিনিষই খেয়ে ফেলবেন; আর পূজো দেবার আগেই যদি নৈবেদ্য খান, তবে তুষ্ট হওয়া দূরে থাক মা ষষ্ঠী বিষম রুষ্টই হবেন। তাই তিনি স্থির করলেন ষষ্ঠীর পূজোর নৈবেদ্য গোপনে মন্দিরে নিয়ে যাবেন।

নিমাই বাইরে খেলা কচ্ছেন দেখে শচীদেবী নৈবেদ্যের দ্রব্য আঁচলে লুকিয়ে মন্দিরের দিকে চললেন। যেতে যেতে বার বার পেছন দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলেন। পেছন দিকে নিমাইকে কোন খানে দেখতে পেলেন না বটে, কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেলেন তিনি সামনের দিক থেকে আসছেন। একেবারে সামনে এসে নিমাই জিজ্ঞেস করলেন—"তোমার আঁচলে কি মা?"

মা বললেন—"তুমি ঘরে গিয়ে খেলা কর বাবা, পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?"

নিমাই জবাব দিলেন—"আঁচলে কি আছে আগে দেখি, তারপর যা'ব। তুমি নিশ্চয়ই খাবার লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছ। আমি খা'ব।"

মা যা ভয় ক'রেছিলেন তাই শেষটায় হ'ল। জিভ কেটে মা

বললেন—"ছি বাবা, অমন কথা বলতে নেই। আগে পূজো হোক, তারপর তোমাকে খৈ, কলা আর সন্দেশ দেবো।"

নিমাই অমনি ব'লে উঠলেন,—"তোমার পূজোর ঢের দেরী, আমি দেরী করতে পারব না, এক্ষুণি খা'ব। আমার ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে।"

এই ব'লেই হঠাৎ এক টান মেরে, নিমাই মায়ের হাত থেকে নৈবেদ্য নিয়ে দিলেন দৌড়; তারপর মাকে দেখিয়ে দেখিয়ে নৈবেদ্য খেতে লাগলেন। মায়ের যেমন হ'ল রাগ তেমনি হ'ল ভয়। বললেন—"বামুনের ছেলে হ'য়ে তুই এমন কাণ্ড করলি! ইচ্ছে হয় গঙ্গায় ঝাঁপ দেই।"

নিমাই বললেন—"তুমি রাগ কচ্ছ কেন মা? আমি খেলেই তোমার ঐ ষষ্ঠীর খাওয়া হয়, আর তিনিও খুসী হন।"

শচীদেবী চোখের জল ফেলতে ফেলতে ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর কাছে গিয়ে কত কাকতি-মিনতি ক'রে ক্ষমা চাইলেন!

মা ষষ্ঠী বোধ হয় তুষ্ট হ'তে পারেন নি—রুষ্টই হ'য়েছিলেন, কারণ দেখা গেল নিমাইয়ের উৎপাত একটুও কমে নি, আর শান্তি-স্বস্ত্যয়নেও শচীদেবী শান্তির লেশমাত্রও টের পেলেন না।

নিমাই ব'লে উঠ্‌লেন,—"তোমার পুজোর ঢের দেরী, আমি...এক্ষণি খা'ব

নিমাইয়ের আবির্ভাব

শীতের জের তখনও একেবারে মেটে নি। বসন্তের মিষ্টি হাওয়া বইতে সুরু ক'রেছে। গাছে গাছে নতুন পাতা আর দিকে দিকে কোকিলের কুহু কুহু।

তখন ১৪০৭ শকাব্দ। তারপর প্রায় পাঁচশো বছর কেটে গেছে। ২০এ ফাল্গুন শুক্রবার পূর্ণিমা। সন্ধ্যার সময়ই চন্দ্রগ্রহণ।

গ্রহণ লেগেছে। দলে দলে হাজার হাজার নরনারী চ'লেছে গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে। চারদিক থেকে হাজার হাজার লোক দল বেঁধে কীর্ত্তন গাইতে গাইতে চ'লেছে। সকলের সমবেত কণ্ঠের হরিনাম আর খোল-করতালের বাদ্য সারা নবদ্বীপ আর তার আকাশ-বাতাস মুখর ক'রে তুলেছে। ঠিক এমনি সময়ে ভূমিষ্ঠ হ'লেন নিমাই। জগন্নাথ মিশ্র তাঁর বাপ, আর শচীদেবী তাঁর মা।

জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপের লোক নন, তাঁর পৈতৃক বাড়ী শ্রীহট্টে। ইনি শ্রীহট্টেই ব্যাকরণ পাঠ করেন, তারপর আসেন নবদ্বীপে। নবদ্বীপ ছিল বাংলাদেশে শিক্ষা ও জ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এখানে এসে তিনি আরও জ্ঞান লাভের আশায় পড়াশুনা করেন। ক্রমে তিনি মহাপণ্ডিত ব'লে পরিচিত হ'লেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হ'য়ে নবদ্বীপের নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী তাঁর কন্যা শচীদেবীকে তাঁর সঙ্গে বিয়ে

দিলেন। জগন্নাথ অধ্যাপক হ'য়ে নবদ্বীপেই বাস করতে লাগলেন। শ্রীহট্ট থেকে বহু মেধাবী ছাত্র তখন নবদ্বীপে পড়তে আসতেন এবং শেষটায় নবদ্বীপেই থেকে যেতেন।

জগন্নাথ ও শচীদেবীর একে একে আটটি মেয়ে হ'য়েছিল, কিন্তু বেঁচে রইল না একটিও। তারপর হ'ল এক ছেলে, নাম বিশ্বরূপ। নিমাই তাঁদের দশম সন্তান। বিশ্বরূপের নামের সঙ্গে মিল রেখে জগন্নাথ তাঁর নাম রেখেছিলেন বিশ্বম্ভর; কিন্তু শচীদেবী তাঁকে নিমাই ব'লেই ডাকতেন। নিমাই জগতে বহু নামেই পরিচিত, যে নামটি যাঁর বেশী ভাল লাগে তিনি তাই বলেন। তাঁর প্রত্যেকটি নামই খুব সুন্দর। কয়েকটি বলা যাক্—নিমাই, বিশ্বম্ভর, গৌরাঙ্গ, গৌরহরি, গৌরসুন্দর, চৈতন্য, গোরাচাঁদ, কৃষ্ণচৈতন্য, মহাপ্রভু।

অতিথি নাকাল

ভারতের নানান তীর্থ ঘুরে এক ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হ'লেন জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতে। অতিথি পরম গুরু, তাই মিশ্র মহাশয় তাঁকে সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। মিশ্র মহাশয়ের অবস্থা স্বচ্ছল না হ'লেও অতিথির আহারের জন্য যথাসাধ্য নানা দ্রব্য সংগ্রহ করলেন।

অতিথিটি অন্যের রান্না করা খাদ্য খেতেন না, নিজেই রান্না ক'রে খেতেন।

বেলা হ'য়েছে। অতিথি ঠাকুরের রান্নাও হ'য়ে গেছে।

ভাত, ডাল, তরকারী সব সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে সামনে ব'সে ব্রাহ্মণ চোখ বুজে ভগবানকে নিবেদন কচ্ছেন, আর সেই ফাঁকে নিমাই এসে থালা থেকে এক মুঠো ভাত তুলে মুখে পূরে দিলেন। চোখ খুলে দেখতে পেয়েই ব্রাহ্মণ ত 'হায় হায়' ক'রে উঠলেন।

জগন্নাথ মিশ্র ছুটে এলেন, ছেলের এই কাণ্ড দেখে ভয়ানক রেগে গেলেন। ছেলেকে এই মারেন ত এই মারেন ভাব। ব্রাহ্মণ তাঁকে অতি কষ্টে থামিয়ে বললেন—"রাগ করবেন না মিশ্র মশায়। শিশু ত দুষ্টুমিই করে, ভালমন্দ কি বোঝে? ভগবান যে দিন যা খাওয়ান সেদিন তাই খেতে হয়। আপনার ঘরে যদি ফল টল কিছু থাকে দিন, তাতেই আমার যথেষ্ট হবে।"

মিশ্র মহাশয় বললেন—"তা কি হয়? অতিথি উপোস ক'রে কলে যে মহাপাপ হবে। আপনাকে কষ্ট ক'রে আর একবার রাঁধতেই হবে।"

অতিথির রাঁধবার সব আয়োজন ক'রে দিয়ে তিনি নিমাইকে ধমক দিয়ে বললেন—"পাজী ছেলে, ফের দুষ্টুমি করবি ত হাড় গুঁড়িয়ে দেবো।"

সত্যিই নিমাই শিশু হ'লেও এত উৎপাত করতেন যে, পাড়াশুদ্ধ লোক ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়ত। সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে তাদের বাড়ীতে খাবার চুরি করতে আর মারামারি বাধিয়ে দিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। প্রতিবেশীরা অনেক সময়ে সহ্য করতে না পেরে কখনো বা জগন্নাথ মিশ্রের কাছে, কখনো বা শচীদেবীর কাছে নালিশ দিত।

অনেক বলা কওয়ার পর অতিথি আবার রান্না করতে লাগলেন, আর এদিকে শচীদেবী নিমাইকে নিয়ে পাশের বাড়ীতে গেলেন। সেখানে নিমাই অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে লাগলেন।

রান্না হ'য়ে গেলে ব্রাহ্মণ আগের মতই চোখ বুজে মন্তর প'ড়ে ভগবানকে নিবেদন করলেন। চোখ খুলেই দেখেন যে, নিমাই এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়ে ব'সে আছেন। জগন্নাথ মিশ্র আর শচীদেবী ছুটে এলেন, ভাবলেন—কী ভীষণ বদমায়েস ছেলে! এই খেলা কচ্ছিল, কোন্ ফাঁকে চুপি চুপি এসে এমন সর্ব্বনাশ করলে!

জগন্নাথ মিশ্র এতই রেগে গেলেন যে, নিমাইয়ের হাড় না গুঁড়িয়ে আর ছাড়বেন না বোঝা গেল। ব্রাহ্মণ এবারেও অতি কষ্টে তাঁকে থামালেন। নিমাইয়ের হাড়গুলো যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটিই র'য়ে

গেল বটে; কিন্তু মিশ্র মহাশয়ের মুখ থেকে আর কোন কথাই বেরুতে পারল না—তাঁর এতই দুঃখ, এতই লজ্জা হচ্ছিল।

ঠিক এমনি সময়ে সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন নিমাইয়ের জ্যেষ্ঠ ভাই বিশ্বরূপ। কী সুন্দর নাক, মুখ, চোখ ঐ বিশ্বরূপের দেবদূত যেন স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। বিশ্বরূপ যখন ব্রাহ্মণকে আবার রান্না করার জন্য অনুরোধ করলেন, ব্রাহ্মণ তখন আর রাজী না হ'য়ে পারলেন না।

আবার রান্নার আয়োজন হ'ল। এবার যাতে নিমাই আ বেরিয়ে আসতে পারেন এই জন্য তাঁকে ঘরের ভেতর রেখে জগন্নাথ মিশ্র স্বয়ং ব'সে রইলেন। কিন্তু রান্না হ'তেও সময় লাগে ত। জগন্নাথ অনেকক্ষণ ব'সে আছেন। সর্ব্বক্ষণ মানুষ ত সমান সতর্ক থাকতে পারে না। নিমাই শিশু হ'লেও তাঁর বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তিনিও সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

যেমনি জগন্নাথ একটু অসতর্ক হ'য়েছেন এবং যেমনি তাঁর একটু ঝিমুনি এসেছে, নিমাইও অমনি চুপি চুপি বেরিয়ে পড়েছেন। এদিকে ব্রাহ্মণও অন্ন নিবেদন ক'রে চোখ খুলতেই দেখলেন ভাত নেবার জন্য নিমাই হাত বাড়িয়েছেন। তিনি মনে করলেন, যে গোপালকে তিনি অন্ন নিবেদন ক'রেছেন সেই গোপালেরও এই-ই ইচ্ছা, এই শিশুকেও তিনিই পাঠিয়েছেন। এই ধারণা হওয়ায় গোপালেরই প্রসাদ মনে ক'রে তিনি অন্ন গ্রহণ করলেন।

এদিকে নিমাইও ঘরে চ'লে এলেন। জগন্নাথ গিয়ে ব্রাহ্মণের আহার শেষ হ'য়েছে দেখে অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করলেন।

জগন্নাথের ক্রোধ

নিমাইয়ের জ্বালায় গঙ্গায় নাওয়া দায়। ছেলেরা গঙ্গায় নাইতে যায়, নিমাইও যান, সকলের গায়ে জল ছিটিয়ে দেন, কখনো কখনো মুঠো মুঠো বালি তাদের নাকে মুখে চোখে ছুঁড়ে মারেন, কখনো ডুব দিয়ে তাদের পা ধ'রে টান মারেন ; ঘাটের ওপরে সকলের কাপড় থাকে, নেয়ে উঠে কেউ আর নিজের কাপড় পায় না, নিমাই সব কাপড় মিশিয়ে রাখেন, না হয়তো সরিয়ে রাখেন, উৎপাতের চোটে সকলেই অস্থির।

নানা রকমের উৎপাত প্রতিবেশীরা স'য়ে এসেছে, কারণ তা'রা নিমাইকে সত্যিই ভালবাসত। যত দুষ্টুমিই করুক না কেন, কেউ তাঁর বাপের কাছে কিছু বলত না। কিন্তু নাওয়ার সময়ে প্রত্যহ জ্বালাতন কি সহ্য করা যায়? রোজই নালিশ যেতে লাগল জগন্নাথ মিশ্রের কাছে। তিনি দু' এক দিন সহ্য ক'রে গেলেন, কিন্তু একদিন আর পারলেন না, গেলেন ভয়ানক চটে ; তাই স্থির করলেন গঙ্গার ঘাট থেকে ছেলেকে মারতে মারতে বাড়ীতে নিয়ে আসবেন।

নাওয়ার সময় হ'য়েছে। নিমাই বাড়ীতে নেই। নিশ্চয়ই নাইতে গেছে মনে ক'রে জগন্নাথ একটা লাঠি হাতে ক'রে বেরিয়ে পড়লেন।

নিমাইয়ের বন্ধুর অভাব ছিল না, তাদেরই দু' একজন ছুটে গিয়ে নিমাইকে খবর দিলে। ব্যস্, আর কি!

নিমাইও গঙ্গার ঘাট থেকে অমনি দে ছুট, কিন্তু ভিন্ন পথে। একদম বাড়ীতে এসে দিব্যি শান্তশিষ্ট নিরীহ ছেলেটির মত মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। গঙ্গার ঘাটে নিমাইকে না পেয়ে বাপও বাড়ীতে ফিরে এলেন।

বাপকে অনেকটা শান্ত হ'তে দেখে নিমাই তাড়াতাড়ি তেল মেখে নাইতে চললেন।

এমনি ক'রে বাপকে এমন ফাঁকি দিতেন যে, তিনি তাঁর কোন দুষ্টুমিই ধরতে পারতেন না।

বিশ্বরূপ

সকাল নেই, তুপুর নেই, বিকেল নেই, কেবল পড়া আর পড়া। শৈশবেই বিশ্বরূপের পড়াশুনায় অসাধারণ মনোযোগ।

তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল লোকনাথ। লোকনাথ তাঁর মামাত ভাই, বয়সেও সমান। খেলাধূলো, গল্পগুজব, পড়াশুনো তু'জনের একত্রেই হয়।

মাত্র ষোল বছর বয়সেই বিশ্বরূপ খুব বড় পণ্ডিত হ'য়ে উঠেছেন। নবদ্বীপের বিখ্যাত ভক্ত পণ্ডিত অদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ী তিনি রোজ যান। সেখানে বড় বড় পণ্ডিত আসেন, কত বড় বড় বিষয়ের আলোচনা হয়; বিশ্বরূপ শোনেন, বড়ই ভাল লাগে তাঁর এই সব শাস্ত্রালাপ। ভক্তির কথা, বৈরাগ্যের কথা যখন হয়, তিনি তন্ময় হ'য়ে যান, খাওয়া-দাওয়া, বাড়ী-ঘর তাঁর কিছুই আর মনে থাকে না।

বিশ্বরূপের কী অদ্ভুত শক্তি! গুরুর কাছ থেকে যা শোনেন, তা ত ভোলেন না বটেই, নিজেও যত শক্ত শক্ত বই পড়েন সবই যেন তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে যায়। তাঁর চেহারাও ঠিক তেমনি সুন্দর। দৃষ্টি কী প্রশান্ত, মুখখানা লাবণ্যে ঢল-ঢল, স্বভাব কী সুন্দর, কথা কী মধুর। বৃদ্ধ পণ্ডিত এবং ভক্তরাও তাঁকে পেলে ভারি তৃপ্তি পান।

এমন সোনার চাঁদ ছেলে যাঁদের, সেই বাপ মা'র ত আনন্দ হওয়ারই কথা। তাঁদের যে অনেক আশার ধন এই ছেলে। তারই মুখ চেয়ে যে তাঁরা ভবিষ্যতের অনেক রঙীন কল্পনায় বিভোর হ'য়ে আছেন।

অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহ থেকে তুপুর বেলা খাওয়ার সময়ে বিশ্বরূপ

বাড়ীতে আসেন। শেষে এমন হ'তো...
আসতেন না। নিমাই গিয়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসতেন। নিমাইয়ের বয়স তখন ছয় বছর মাত্র। তিনি বড়ই ভালবাসতেন এই নিমাইকে, আর নিমাইও দাদাকে পেলেই একেবারে শান্তশিষ্ট হ'য়ে যেতেন।

নিমাই দাদাকে ডাকতে অদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ী গেলেই অদ্বৈত নিমাইকে দেখিয়ে দিয়ে বলতেন—"এই শিশুটিকে দেখলেই আমি নিজেকে ভুলে যাই, আমার সমস্ত মনপ্রাণ যেন হরণ করে। কেন এমন হয়? এটি কি বস্তু?"

জগন্নাথ মিশ্রের ত অন্নচিন্তা চমৎকার, কাজেই তাঁকে চারদিকে নানান কাজে ছুটোছুটি করতে হ'ত, আর বিশ্বরূপ ত থাকতেন অদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ী। পিতা-পুত্রের বিশেষ মেলা-মেশা বড় একটা হ'ত না। একদিন পথে বিশ্বরূপকে দেখে জগন্নাথ ভাবলেন ছেলেকে এখন বিয়ে করালে মন্দ হয় না। শচীদেবীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে নিয়ে আলোচনা করলেন। শচীদেবী ত এই-ই চান। মা লক্ষ্মীটির মত পুত্র-বধূকে ঘরে বরণ ক'রে নেবেন, নিজে তাকে মানুষ ক'রে তুলবেন, এমন কত কি আকাঙ্ক্ষাই তাঁর একে একে জাগতে লাগল।

দুনিয়ার মজাই এই যে, মানুষ ভাবে একটা, কিন্তু বিধাতার বিধানে হয় আর একটা। বিবাহের কথা শুনেই বিশ্বরূপ একেবারে বিষণ্ণ হ'য়ে পড়লেন। সংসার তাঁর ভাল লাগে না, বিবাহ ক'রে তিনি সংসারে আবদ্ধ হবেন? তাঁর মনে তখন বৈরাগ্যের উদয় হ'য়েছে। পিতামাতাকে তিনি ভালবাসেন, দেবতার মত ভক্তি করেন। তাঁরা বিয়ে করতে বললে তিনি কি করবেন? আবার

হ'য়ে তাঁদের মনে আঘাত দেবেন কি ক'রে? বিবাহ করবেন না, গুরুজনের আদেশও লঙ্ঘন করবেন না, এই স্থির করলেন। এক মাত্র পন্থা রইল সংসার ত্যাগ ক'রে চ'লে যাওয়া। তিনি এই পন্থা অবলম্বন করতেই প্রস্তুত হ'লেন। গৃহ ত্যাগ করলেও বাপ-মায়ের প্রাণে ভীষণ আঘাত লাগবে বটে, কিন্তু পরিণামে তাঁদের চিরমঙ্গলই হবে। যে বংশে সত্যিকার সন্ন্যাসী পুরুষ জন্মায় সে বংশ সব পাপ থেকে উদ্ধার পায়, শাস্ত্রে এই কথা বলে। এই সব চিন্তা করতে করতে নিমাইয়ের মুখখানা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। বড়ই দুঃখ হ'ল। কিন্তু বাইরে যার ডাক পড়ে, সে কি আর ঘরে থাকতে পারে?

একখানি পুঁথি হাতে ক'রে বিশ্বরূপ মায়ের কাছে গিয়ে বললেন —"মা, আমার একটা কথা তোমায় রাখতেই হবে।"

—"কি কথা বল।"

বিশ্বরূপ বললেন—"নিমাই বড় হ'লে এই পুঁথিখানা তাঁর হাতে দিয়ে বলবে—তোর দাদা তোকে এই পুঁথি পড়তে দিয়েছে।"

—"এ আবার কি রকম কথা? তুমি ত নিজেই দিতে পারবে?"

বিশ্বরূপ বললেন—"যদি পারি আমিই দেবো, তা হ'লে আর তোমাকে দিতে হবে না; কিন্তু মরণ-বাঁচনের কথা তো কিছুই বলা যায় না মা। আমার এ কথাটি রক্ষা ক'রো মা।"

মা ত কথা শুনেই অবাক্। তাঁর বুক কেঁপে উঠল। বিশ্বরূপ তাঁর সামনে এ কী কথা বললে!

বিশ্বরূপ পুঁথিখানা দিলেন, আর মাও নির্ব্বাক্ থেকেই হাত বাড়িয়ে নিলেন।

এদিকে বিশ্বরূপ তাঁর বাল্যবন্ধু লোকনাথকে সব কথা খুলে বললেন। একবয়সী হ'লেও লোকনাথ তাঁকে বন্ধুর মত ভালও বাসত আবার গুরুর মত ভক্তিও করত। তাঁর কথা শুনেই লোকনাথ বললে—"তুমিই যদি সন্ন্যাসী হও, আমিও নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী হ'ব। তুমি যেখানে যাবে আমিও সেইখানেই যা'ব। আমায় ছেড়ে তুমি যাবে কোথা ?"

তাঁর কথা শুনে বিশ্বরূপ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী হ'লেন।

তখন শীতকাল। রাত্রি একপ্রহর হ'তে না হ'তেই লোকালয়ের সমস্ত কোলাহল নিস্তব্ধ। বিশ্বরূপ ও লোকনাথ জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতে শুয়ে আছেন। রাত্রি যখন প্রহরখানেক আছে তখন লোকনাথ ও বিশ্বরূপ উঠলেন, সঙ্গে নিলেন একখানা পুঁথি। তারপর নিদ্রিত মাতাপিতাকে প্রণাম ক'রে এবং মনে মনে নিমাইকে ভগবানের চরণে অর্পণ ক'রে নিঃশব্দে লোকনাথকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বরূপ বেরিয়ে পড়লেন। দু'জনে খুব তাড়াতাড়ি গঙ্গার তীরে এসে উপস্থিত হ'লেন, কিন্তু শীত-কালের শেষরাত্রে পার হবেন কি ক'রে ? কোন উপায় নেই।

চারদিক কুয়াসায় ঢেকে আছে। গঙ্গার জল কন্ কন্ করছে। আস্তে আস্তে দু'জনই গঙ্গায় নামলেন। বাঁ হাতে পুঁথিখানি উঁচু ক'রে ধ'রে ডান হাত দিয়ে সাঁতার কেটে তাঁরা গঙ্গা পার হ'লেন। তাঁরা চ'লেছেন তখন বিশ্বের অন্তহীন পথে। পথ তাঁদের ক্রমাগত সামনের দিকেই টানছে, তাই শীতের প্রচণ্ডতা একটু টেরও পেলেন না। ভিজে কাপড়ে ক্রমাগত ছুটে চললেন সামনের দিকে। পেছনের সমস্ত বাধা যাঁরা কাটিয়ে আসেন তাঁদের দৃষ্টি আর পেছন দিকে ফেরে না, দৃষ্টি ক্রমাগত সামনের দিকেই চলে। সামনের টানে তাঁরা অনন্তপথের পথিক হন।

ভোর হ'য়েছে। বাপ-মা মনে করলেন বিশ্বরূপ অদ্বৈতের বাড়ী গিয়েছেন। তাঁদের মনে কোন সন্দেহই হয় নি। বেলা দুপুর হ'ল, খাবার সময়ও কেটে গেল। বিশ্বরূপ আর ফেরেন না। অদ্বৈতের বাড়ীতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল তিনি সেদিন সেখানে যান নি। জগন্নাথ ও শচীদেবী ক্রমে ক্রমে শুনলেন ও বুঝলেন যে, বিশ্বরূপ তাঁদের মায়া কাটিয়েছেন চিরকালের জন্য।

ষোল বছরের ছেলে অনন্তপথের পথিক। তাও যে সে ছেলে নয়, বাপ, মা, ভাইকে যে সব চেয়ে বেশী ভালবাসে, অমন বুদ্ধি, অমন চেহারা, অমন দেবদূতের মত সরল, সুমিষ্ট স্বভাব যার, সেই ছেলে আজ দণ্ড আর কমণ্ডলু নিয়ে গাছতলায় সন্ন্যাসী হ'য়ে ব'সে আছে; এই ভেবে সকলেই হায় হায় করতে লাগল। বাপ-মার তো কথাই নেই, তাঁদের বুক ভেঙে গেল। কিন্তু তাঁরা বিশ্বরূপের সন্ধান নিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা ত করেনই নি, ইচ্ছাও করেন নি, বরং প্রার্থনা ক'রেছিলেন যে, ছেলে যখন অনন্তের সন্ধানেই বেরিয়েছে, সে যেন পেছনের মায়ায় পেছনে না ফেরে, যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। এমন বাপ-মার কোলেই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হয়।

এদিকে গঙ্গাপার হ'য়ে ক্রমাগত পশ্চিম দিকে চ'লে চ'লে কয়েক দিনের মধ্যেই এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেয়ে বিশ্বরূপ মন্ত্র গ্রহণ করলেন। লোকনাথ তৎক্ষণাৎ বিশ্বরূপের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করলেন, সুতরাং লোকনাথ হ'লেন বিশ্বরূপের শিষ্য। দু'জনেই দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করলেন।

নিমাই তখন মোটে ছ' বছরের ছেলে। দাদাকে তিনি বাপের চেয়ে বেশী ভক্তি করতেন। ছেলেমানুষ এখানে সেখানে খেলা ক'রে

বেড়াচ্ছেন ; বাড়ীতে কান্না শুনে ছুটে এসে যখন শুনলেন দাদা আর আসবেন না, অমনি অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেলেন। বাপ-মা তখন নিমাইয়ের শুশ্রূষা করতে লাগলেন। জ্ঞান ফিরে এলে বাপ-মার চোখে জল দেখে নিমাই বললেন—"তোমরা কেঁদ না, শান্ত হও ; আমি ত আছি, আমি তোমাদের পালন করব।"

তাঁর কথা শুনে আর তাঁকে বুকে নিয়ে বাপ-মা একটু সান্ত্বনা পেলেন।

নিমাইয়ের দুরন্তপনা সেই দিন থেকেই আপনা-আপনি বন্ধ হ'য়ে গেল।

পাঠবন্ধ

নিমাই বড় লক্ষ্মীছেলে হ'য়েছে, আর দুষ্টুমি করে না; সব সময়েই বাপ-মার কাছে থাকে। অবসর মত বাপ কোলে বসিয়ে ছেলেকে পড়ান আর মা ছেলের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। তাঁদের সংসারে নিমাই এখন অন্ধের যষ্টি। বিশ্বরূপের অভাবেও তাঁরা একটু সান্ত্বনা পেলেন।

একদিন বাড়ীতে পূজো হ'য়ে গেছে। নৈবেদ্যে যে পান ছিল নিমাই সেই পানটি যেমনি খেয়েছেন, অমনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলেন। নিমাইয়ের এ অবস্থায় বাপ-মা বিশেষ ব্যস্ত হ'লেন না, কারণ নিমাইয়ের অজ্ঞান হ'য়ে যাওয়া নতুন নয়, মাঝে মাঝেই ত এ রকম হ'য়ে থাকে।

চেতনা পেয়ে নিমাই বাপ-মাকে এক অদ্ভুত কথা বল্লেন—"দাদা এসেছিলেন, এসেই আমাকে নিয়ে গেলেন, বললেন, 'তুমিও আমার মত সন্ন্যাসী হও।' আমি দাদাকে বললুম, 'আমার বয়েস নিতান্ত অল্প, সন্ন্যাসের কি বুঝব? ঘরে থেকে আমি বাবা আর মার সেবা করব। তা হ'লেই ভগবান সন্তুষ্ট হবেন।' আমার এ কথা শুনে দাদা বললেন, 'আচ্ছা তুমি যাও, বাবা আর মাকে আমার প্রণাম দিও'।"

সংসার ছেড়ে গিয়েও বিশ্বরূপ বাপ-মাকে ভোলেন নি, এইটি ভেবে বাপ-মা খুব আনন্দিত হ'লেন বটে, কিন্তু প্রাণে তাঁদের ভয়ানক ভয়ও হ'ল। নিমাই বলে কি? বিশ্বরূপ কি শেষে নিমাইকেও ঘর-ছাড়া করবে নাকি?

মা কিছুদিনের মধ্যে এ সব ভুলে গেলেন বটে, কিন্তু বাপ একেবারেই ভুললেন না, এই কথা নিয়ে মনে মনে কত আলোচনাই করলেন। ভাবলেন, বিশ্বরূপ লেখাপড়া শিখে, শাস্ত্র প'ড়ে, বড় বড় পণ্ডিতের আলোচনা শুনে বুঝলে যে এ সংসার কিছু না, সংসার ত্যাগ না করলে আর মানুষের মুক্তি নেই। নিমাই যদি পণ্ডিত হয় তবে তারও তো এমন ধারণা হ'তে পারে, হয়তো সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে। কাজেই নিমাইয়ের লেখাপড়া বন্ধ ক'রে দেওয়া যাক। পণ্ডিত না হ'লে তবু ঘরে থাকবে। খাওয়াপরা?—তা জীব দিয়েছেন যিনি আহারও দেবেন তিনি।

অনেক ভেবে চিন্তে জগন্নাথ এই-ই স্থির করলেন, অমনি নিমাইকে ডেকে এনে বললেন—"দেখ বাবা, আজ থেকে তোমার পাঠ বন্ধ।"

বাবা ব'লেছেন পাঠ বন্ধ, তাঁর আদেশ তো অমান্য করা যায় না, কাজেই নিমাইও পাঠ বন্ধ ক'রে দিলেন। পাঠ বন্ধ হওয়ায় আবার তাঁর দুরন্তপনা দেখা দিল; এবার এপাড়ায় সে-পাড়ায় যেতে লাগলেন, গঙ্গায় নাইতে গেলে আর সহজে ফিরে আসেন না। পূর্ব্বেরই মত আবার সকলে ব্যতিব্যস্ত হ'তে লাগল।

একদিন নিমাই আস্তাকুঁড়ে এঁটো হাঁড়ির ওপর হাঁড়ি বসিয়ে তার ওপর নিজে ব'সে আছেন। অনাছিষ্টি কাণ্ড। শচীদেবী কত অনুনয়-বিনয় ক'রে বললেন, কিন্তু নিমাই ব'সেই রইলেন, বললেন—

"আমায় যদি পড়তে দাও তো এখান থেকে আসব, আর না দাও তো একটুও নড়ব না।"

সেখানে যে কয়েকজন স্ত্রীলোক এসে জুটেছিলেন তাঁরা শচী-[illegible]কেই দোষ দিয়ে বললেন—"সত্যিই ত নিমাইয়ের আর দোষ কি ? [illegible]মানুষ. লেখাপড়া করতে চায়, তোমরা করতে দেবে না, দুষ্টুমি [illegible]বে না ত কি করবে ? আমাদের ছেলেগুলো একদম পড়তে চায় না, কত মারধর ক'রে তবে পড়াতে হয়, আর নিমাই জোর ক'রে পড়তে চায়, এ তোমাদের সৌভাগ্য।"

শচীদেবী নিমাইকে বললেন—"আচ্ছা বাবা, তুমি যাতে পড়তে পার [illegible] আমি করব।"

জগন্নাথ কি করেন ? দায়ে প'ড়ে নিমাইকে আবার পড়তে দিলেন [illegible] পণ্ডিতের কাছে। যেমন পড়া-শুনোর অনুমতি পাওয়া [illegible]। নেহাৎ শান্তশিষ্ট হ'য়ে নিমাই খুব মন দিয়ে পড়তে লাগলেন। [illegible]। তাঁর এত মনোযোগ যে, তাঁর সমবয়সী ছেলেরা যখন খেলায় [illegible] থাকে তখনও নিমাই নির্জ্জনে ব'সে বই পড়েন।

নিমাই···আস্তাকুঁড়ে গিয়ে দাঁ

জগন্নাথের দেহত্যাগ

নিমাইয়ের বয়স ন' বছর। ব্যাকরণের অতি জটিল বিষয়গুলোও একবার বললেই তিনি দিব্যি বোঝেন।

এই সময়েই তাঁর উপনয়ন হ'ল। একে কাঁচা সোনার মত তাঁর দেহের রং, তার ওপরে টক্‌টকে লাল কাপড পরা, দেখতে এমনি মনোহর যে, সকলে মুগ্ধ হ'যে তাঁর দিকে চেয়ে রইল।

নিমাইয়ের সুখ্যাতি এখন হাজার হাজার লোকের মুখে। বাপ-মা এতে বডই আনন্দ পান। ছেলে পড়া ছাড়া আর কিছুই করে না। দারিদ্র্যের মধ্যেও এখন জগন্নাথের দিনগুলো বেশ সুখেই কাটতে লাগল। এমনি ক'রে দেখতে দেখতে নিমাইয়ের বয়স এগারো বছর হ'ল। জগন্নাথ ত তখন বৃদ্ধই হ'য়েছেন, শচীদেবীর বয়সই তখন পঞ্চান্ন।

একদিন জগন্নাথের জ্বর হ'ল। এই জ্বরই তাঁর কালজ্বর। স্বামীর অন্তিমকালে শচীদেবীর বুক ভেঙে কান্না বেরুবার উপক্রম হ'চ্ছে, নিমাই তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"কাঁদবার সময় ত পরেও হবে মা, এখন বাবার অন্তিমকালের কর্ত্তব্য আমাদের করতে হবে, এস বাবাকে তীরস্থ করি।"

কুলু কুলু শব্দে স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, পবিত্র-সলিলা সুরধুনী ব'য়ে চ'লেছে সুদূর সমুদ্রের পানে। জগন্নাথের অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে আর অর্দ্ধ অঙ্গ স্থলে। শেষ নিঃশ্বাসের আর বিলম্ব নেই।

নিমাইয়ের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল। পিতার পা দু'খানি বুকে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—"আজ থেকে আমার বাবা বলা শেষ হ'ল, আমাকে আর কে যত্ন ক'রে পড়াবে? আমায় কার হাতে সঁপে দিয়ে চললে বাবা?"

একেবারে নিবে যাওয়ার পূর্ব্বে প্রদীপ যেমন একবার দপ্‌ ক'রে জ্বলে ওঠে, তেমনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার পূর্ব্বে জগন্নাথও একটু সজীব হ'য়ে উঠে নিমাইকে বুকের ওপর নিয়ে মৃদুস্বরে বললেন—"মনের সাধ আমার মিটল না বাবা। ভগবানের চরণেই তোমাকে সঁপে দিলুম। আমায় ভুলে যেও না বাপ আমার।"

আর কথা বেরুল না। চোখ দুটি বুজে জগন্নাথ এমন ঘুমেই অচেতন হ'য়ে পড়লেন, যে ঘুম আর কখনো ভাঙে না।

গঙ্গাদাসের টোলে

বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করায় শচীদেবী আধমরা হ'য়েই ছিলেন, তারপর এই নিদারুণ আঘাত। সংসার কি আর তাঁর ভাল লাগে? কিন্তু কী করবেন? নিমাইয়ের মুখ চেয়ে তাঁকে সমস্ত দুঃখই নীরবে সহ্য করতে হ'ল।

এদিকে সংসারেও দারুণ অভাব; কিন্তু নিমাইকে তিনি বিশেষ কিছুই টের পেতে দেন না। তাঁর সবচেয়ে বেশী চিন্তা হ'ল নিমাইয়ের পড়াশুনা নিয়ে। অনেক ভেবে চিন্তে ও দু'চার জন আত্মীয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তিনি নিমাইকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়তে দেওয়াই স্থির করলেন।

সারাদেশে ব্যাকরণে গঙ্গাদাসের মত বড় পণ্ডিত আর কেউই ছিলেন না। স্বভাবে, চরিত্রে, দয়ায়, দাক্ষিণ্যেও তাঁর মত লোক খুব কমই ছিল। চারদিকেই তাঁর নামডাক ছিল সকলের চেয়ে বেশী। শচীদেবী তাই নিমাইকে নিয়ে তাঁর বাড়ী গেলেন এবং চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন—"আমার ছেলে আজ সম্পূর্ণ অসহায়, তাই তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। ওকে নিজের ছেলে মনে ক'রে পড়াতেই হবে।"

এই ব'লেই তিনি নিমাইয়ের হাত ধ'রে গঙ্গাদাসকে দিলেন। গঙ্গাদাসও শচীদেবীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,

আমার যতদূর সাধ্য তা আমি নিমাইয়ের জন্য করব। বাপ নেই ব'লে কি আর পড়া বন্ধ হবে?"

নিমাই গঙ্গাদাসের পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করলেন। তিনিও নিমাইয়ের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন।

গুরু পাঠ দিলেই নিমাই বুঝতে পারেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি টোলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ব'লে গণ্য হ'লেন।

নিমাইয়ের বয়স তখন আন্দাজ চৌদ্দ বছর মোটে, কিন্তু তখন টোলে খুব বেশী বয়সেরও ছাত্র পড়ত; এমন কি পঁচিশ, ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ বছরের ছাত্রও পড়ত। বিদ্যালাভ করবার চেষ্টা মানুষ যে কোনও বয়সেই করতে পারে, বেশী বয়স ব'লে এতে লজ্জা করবার কিছুই নেই।

নিমাইয়ের সঙ্গে তখন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে আরও কয়েক-জন বিখ্যাত ছাত্র পড়তেন। এঁদের নাম কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ ও মুরারি গুপ্ত। এঁদের প্রত্যেকই এক একটা দিক্‌পাল। কমলাকান্ত অলঙ্কার শাস্ত্রে অদ্বিতীয়, আর কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রে। এঁরা ত নিমাইয়ের চেয়ে বয়সে ঢের বড় ছিলেনই, মুরারি গুপ্ত ছিলেন বয়সে সকলের চেয়ে বেশী বড়। নিমাই এঁদের সঙ্গে তর্ক করতে যেতেন, কিন্তু তাঁকে নিতান্ত বালক মনে ক'রেই তাঁরা বিশেষ ঘেঁষতে দিতেন না। নিমাই কিন্তু না-ছোড়-বান্দা, শাস্ত্র নিয়ে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক না ক'রে পারতেন না। সকল ছাত্রের চেয়ে বয়সে বড় মুরারি গুপ্ত কিন্তু নিমাইয়ের সঙ্গে তর্কে হেরে গেলেন। মুরারি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ভাবলেন, 'এটি কি মানুষ?'

তর্ক করবার ঝোঁক নিমাইয়ের বড্ড বেশী বেড়ে গিয়েছিল। গঙ্গায় নাইতে গিয়ে টোলের ছাত্রদের সঙ্গে তর্ক আরম্ভ ক'রে দিতেন,

খানিকক্ষণ শাস্ত্র নিয়ে বাকযুদ্ধ ক'রে আর এক ঘাটে যেতেন। কোন কোন দিন আবার এমনও হ'ত যে, গঙ্গা পার হ'য়ে ওপারে কুলিয়ার ঘাটে গিয়েও শাস্ত্রযুদ্ধ করতেন।

সাঁতার কাটতে ভারি ওস্তাদ ছিলেন নিমাই, অনায়াসে দু'চার বার গঙ্গা পার হ'তে পারতেন, বরাবরই ত ডানপিটে কিনা।

সকলের সঙ্গেই নিমাই তর্ক করতেন বটে, কিন্তু কোন বৈষ্ণব দেখতে পেলেই তাকে জব্দ না ক'রে সুস্থ হ'তেন না, বৈষ্ণবের উপর তাঁর ছিল সব চেয়ে বেশী আক্রোশ। অত্যন্ত বৃদ্ধ, পিতার বয়সী বৈষ্ণব হ'লেও তাঁকে জব্দ ক'রে তবে তিনি ঠাণ্ডা হ'তেন।

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে নিমাইয়ের ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত হ'ল। এবার তাঁর ইচ্ছা হ'ল ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে।

রঘুনাথ

ছেলে বটে রঘুনাথ। টোলের সকলের মাথা হেট তাঁর কাছে। দিনরাত ন্যায়শাস্ত্র পড়েন। গুরু বাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁকে ন্যায়ের যে পাঠ দেন, রঘুনাথ একমনে খুব খেটে খুটে তা তৈরি করেন। গুরু খুব খুসী।

এই বাসুদেব সার্ব্বভৌম এত বড় পণ্ডিত যে, তাঁর নাম ভারত-জোড়া। তিনি এক অসাধ্য সাধন ক'রেছিলেন। নবদ্বীপে তখন ন্যায়শাস্ত্র ছিল না, ন্যায় পড়তে হ'লে যেতে হ'ত সুদূর মিথিলায়। মিথিলায়ও বাঙালী ছাত্রেরা ন্যায়শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিতেন। কাজেই মিথিলার পণ্ডিতগণ বাঙালী ছাত্রদের একটু ভয় করতেন, কারণ, তাঁরা সত্যিই মনে ক'রেছিলেন যে, বাঙালী ছাত্রেরাই এক দিন ভারতে ন্যায়শাস্ত্রে সব চেয়ে বড় পণ্ডিত হবেন, তখন মিথিলার গৌরব ম্লান হ'য়ে যাবে। পড়া শেষ হ'য়ে গেলে বাংলাদেশে ফিরে আসবার সময়ে বাঙালী ছাত্রেরা মিথিলা থেকে কোন পুঁথি নিয়ে আসতে পারতেন না। পুঁথির অভাবে তখন নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল।

নবদ্বীপে সর্ব্বপ্রথম রামভদ্র ভট্টাচার্য্য ছোট একটি ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন। এই টোলেই বাসুদেব ন্যায়শাস্ত্র পড়তে আরম্ভ করলেন। বাসুদেবের বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তিনি বুঝতে পারলেন যে, গ্রন্থের অভাবে তাঁর গুরুর পদে পদেই অসুবিধা হয়, কাজেই খুব ভাল পড়া হয় না। এই জন্যই বাসুদেব মনে মনে [illegible]—

যে কোন রকমেই হোক, নবদ্বীপে ন্যায়ের গ্রন্থ আনবেনই। তিনি মিথিলায় গিয়ে ন্যায় পড়তে লাগলেন। ন্যায়ের গ্রন্থ বিরাট, আর তার টীকা-টিপ্পনী আরও বিরাট। তিনি আরম্ভ করলেন সব মুখস্থ করতে। এমনি ক'রে মুখস্থ ক'রেই তিনি ন্যায়ের গ্রন্থ নিয়ে এলেন নবদ্বীপে। কত বড় প্রতিভা হ'লে এমন অসাধ্য সাধন হয়? নবদ্বীপই ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চায় ভারতে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌ল। মিথিলার পণ্ডিতদের আশঙ্কা সত্যেই পরিণত হ'ল।

এই বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলেই রঘুনাথ পড়েন। ন্যায়শাস্ত্রের খুব শক্ত জায়গাও তিনি সহজেই বোঝেন, আর সার্ব্বভৌম মশায়ও প্রাণপণ যত্নে তাঁকে শেখান।

নিমাইও ব্যাকরণ সমাপ্ত ক'রে ন্যায় পড়বার জন্য এই টোলেই এসে উপস্থিত হ'লেন। নতুন এসেছেন ব'লে তিনি অধ্যাপকের তেমন নজরে পড়লেন না।

একদিন বিকেলবেলা নিমাই গিয়ে দেখেন রঘুনাথের খাওয়া হয় নি, সবে রান্না চাপিয়েছেন। সেকালে টোলের পড়ুয়াদের রান্না ক'রে খেতে হ'ত। কত কষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁদের তখন বিদ্যালাভ করতে হ'ত।

নিমাই রঘুনাথকে জিজ্ঞেস করলেন—"সমস্ত দিন কি করলে ভাই? এখন এসেছ রান্না করতে?"

রঘুনাথ বললেন—"খাওয়া ত ভুলেই গিয়েছিলুম ভাই। সার্ব্বভৌম মশায় এক মহাশক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন। কিছুতেই আর উত্তর ঠিক করতে পারি নি। সমস্ত দিন ভাবতে ভাবতে এই বিকেলবেলা উত্তর দিতে পেরেছি।"

নিমাই বললেন—"বল কি! এত শক্ত প্রশ্ন? প্রশ্নটা আমায় একবার বল না ভাই।"

রঘুনাথ বললেন, নিমাই শুনেই অমনি জবাব দিলেন। জবাব শুনে রঘুনাথ অবাক্ হ'য়ে নিমাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন; বললেন—"ভাই, তুমি কি মানুষ না দেবতা?"

রঘুনাথ মনে মনে ভয় পেলেন, ভাবলেন টোলে নিমাইই সেরা পড়ুয়া হ'য়ে উঠবেন, এবং তাঁকে হারাবেন। এভাব মনে জাগলেও তিনি নিমাইকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

নবদ্বীপের কথা

নবদ্বীপ শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসেই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসেই চিরকালের জন্য বিখ্যাত হ'য়ে আছে। এত গৌরব খুব অল্প স্থানেরই আছে। বাণিজ্যের জন্য নয়, শিল্পের জন্য নয়, ঐশ্বর্য্যের জন্য নয়, নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ হ'য়েছিল জ্ঞান ও ধর্ম্মচর্চ্চায় সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র ব'লে। কত মহাজ্ঞানী, মহাপুরুষেরই অবির্ভাব হ'য়েছিল এইখানে। মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য হচ্ছে জ্ঞান; এই জ্ঞানলাভ করবার জন্য নিতান্ত বালক থেকে অত্যন্ত বৃদ্ধ পর্য্যন্ত দিনরাত্রি চেষ্টা করতেন। সমস্ত লোক তখন জ্ঞান ও ধর্ম্মের জন্য পাগল।

অতি ভোরেই হাজার হাজার লোক গঙ্গায় ডুব দিয়ে পূজো করতে বসতেন, আর গঙ্গা একেবারে ফুলময় হ'য়ে যেত। কী পবিত্র, কী সুন্দর দৃশ্যই হ'ত।

তখন পাঠান রাজত্বের শেষ সময়। এখনকার মত লোকের প্রয়োজন খুব বেশী ছিল না, সুতরাং খাওয়া পরা স্বচ্ছন্দেই চলত। ব্রাহ্মণদের ত জ্ঞানের চর্চ্চা করা ছাড়া আর কোন চিন্তাই করতে হ'ত না; তবে কেউ কেউ রাজসরকারে বড় বড় চাকরীও করতেন। সমাজে তাঁদের প্রতিপত্তি বিশেষ থাকত না। হিন্দু-মুসলমানে যথেষ্ট মিলন ছিল। বাংলাদেশে তখন হুসেন সা নবাব, কিন্তু তাঁর রাজ্য পরিচালনা করতেন দু'জন হিন্দু, সনাতন ও রূপ।

এখন যেখানটাকে নবদ্বীপ বলে চারশো বছর আগে সেখানটার

নাম ছিল কুলিয়া। বর্ত্তমান নবদ্বীপের অপর পারে ছিল তখনকার নবদ্বীপ। সেখানে গলিতে গলিতে টোল, প্রত্যেক টোলেই বিখ্যাত অধ্যাপক আর বহু ছাত্র। রাস্তায়, বাড়ীতে, গঙ্গার ঘাটে হাজার হাজার ছাত্রের সব সময়ে নানাশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা চলত।

সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল সকলের ওপরে। অব্রাহ্মণ জাতির বাড়ীতে ব্রাহ্মণ গেলে অব্রাহ্মণ নিজেকে কৃতার্থ মনে করত, কাজেই সমাজের শাসন ছিল ভীষণ কড়া। মানুষে মানুষে সমাজে আকাশ পাতাল তফাৎ ছিল। অধিকাংশ লোকই তখন ছিল শাক্ত। এদের অনেকেই বৈষ্ণবদের প্রতি বিরূপ ছিল, অনেকে মদ খেয়ে প্রকাশ্যেই মাতলামি করত আর বিশিষ্ট বৃদ্ধ বৈষ্ণবদের ওপরও নানারকম উৎপাত করত। মানুষে মানুষে কোন তফাৎ নেই, শুধু ভগবানের নামেই সব পাপতাপ দূর হ'য়ে যায়, প্রেমে, ভালবাসায় জগৎ জয় করা যায়; এইটি কার্য্যত শিক্ষা দেওয়ার জন্যই শ্রীনিমাইয়ের আবির্ভাব হ'য়েছিল।

রঘুনাথের ন্যায়ের বই

একদিন টোলে ব'সে রঘুনাথ নিমাইকে জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি নাকি ন্যায়শাস্ত্রের এক বই লিখছ ?"

নিমাই উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, লিখছি বটে, কিন্তু তুমি কি ক'রে জানলে ?"

রঘুনাথ বললেন—"তা যে ভাবেই হোক জেনেছি। তোমার পুঁথিখানা আমায় একবার দেখতে দেবে, ভাই ?"

নিমাই হেসে বললেন—"কেন দেবো না ? আজকে ত নিয়ে আসি নি।"

রঘুনাথ জিজ্ঞেস করলেন—"কবে আনবে বল ?"

নিমাই বললেন—"কালকে টোলে নিয়ে আসব, আর যখন গঙ্গা পার হ'ব, তখন নৌকোর ওপরে ব'সে তোমাকে প'ড়ে শোনাব।"

নিমাই ন্যায় পড়তে পড়তেই একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁর বয়স মোটে ষোল বছর। এতটুকু বালকের পক্ষে এমন কঠিন জিনিষ বুঝতে পারাই সম্ভব নয়, তাতে আবার বই লেখা।

এদিকে রঘুনাথও একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ এই সময়েই লেখেন। এই গ্রন্থের নাম দীধিতি। দীধিতির মত উৎকৃষ্ট ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ আজ অবধিও জগতে হয় নি। এক বই লিখেই তিনি জগতে অমর হ'য়ে আছেন।

রঘুনাথ বই লিখছেন তা নিমাই জানেন না, কিন্তু নিমাই যে লিখছেন তা কোনও রকমে রঘুনাথ জানতে পেরেছিলেন।

তার পরদিন নৌকোয় ব'সে নিমাই বই পড়তে লাগলেন।

রঘুনাথের ধারণা ও আশা ছিল যে, তিনিই ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হবেন, ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় হবেন; কিন্তু নিমাই যতই তাঁর পুঁথি প'ড়ে যেতে লাগলেন রঘুনাথের মুখও ততই মলিন হ'তে লাগল। তিনি দেখলেন যে, যে ভাব প্রকাশ করতে তাঁর লেগেছে দশ পাতা, সেই ভাবটিই আরও সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে নিমাইয়ের এক পাতাও লাগে নি। ভারতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হওয়ার আশা আর নেই—মনে ক'রে রঘুনাথ গেলেন একেবারে দ'মে।

রঘুনাথের এই ভাবান্তর নিমাই লক্ষ্য করলেন, বললেন—"কি হ'ল ভাই? তোমার মুখ যে শুকিয়ে একেবারে এতটুকু হ'য়ে গেছে!"

রঘুনাথ আর সহ্য করতে পারলেন না, কেঁদে ফেললেন।

নিমাই ব্যস্ত হ'য়ে দুহাত বাড়িয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে জিজ্ঞেস করলেন—"কী ব্যাপার! কাঁদ কেন বল না।"

শিশুর মত সরল মনে রঘুনাথ সব কথাই নিমাইকে বললেন, "আমার বড় সাধ ছিল ভাই, আমি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হ'ব, ন্যায়শাস্ত্রে আমার সমতুল্য আর কেউ থাকবে না। জগতে আমার গ্রন্থই চলবে আশা ক'রে দিনরাত পরিশ্রম ক'রে এখন বুঝলাম আমি পণ্ডশ্রম ক'রেছি। আমার বইয়ের চেয়ে তোমার বই এতই ভাল হ'য়েছে যে, আমার বই আর চলবে না; আমার সকল আশা নির্মূল হ'য়েছে।"

রঘুনাথের ন্যায়ের বই

কথাটা শুনে নিমাইয়ের ভারি দুঃখ হ'ল, তাঁর দু'চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। তিনি বললেন—"এ অতি সামান্য কথা, তুমি আর কেঁদ না। ন্যায়শাস্ত্রে তুমিই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হবে।"

এই কথা ব'লেই নিমাই তাঁর নিজের লিখিত পুঁথিখানি তৎক্ষণাৎ গঙ্গার খরস্রোতে ছুঁড়ে ফেললেন।

রঘুনাথ নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ।

তারপর থেকে নিমাই আর টোলে পড়তে গেলেন না। তাঁর ন্যায় পড়া সমাপ্ত হ'ল।

এবার তিনি নিজেই মুকুন্দ সঞ্জয় নামে এক ধনী ব্রাহ্মণের চণ্ডীমণ্ডপে এক টোল খুলে বসলেন।

বুড়ো পণ্ডিতের দুঃখ

একদিন নিমাই পণ্ডিত রাস্তায় বেরিয়েছেন; সঙ্গে কয়েকটি ছাত্র। তাঁদের সঙ্গে নানা শাস্ত্রালাপ হচ্ছে, আবার মাঝে মাঝে হাসি-ঠাট্টার কথাও চলছে।

তাঁর বয়স তখন উনিশ, গায়ের রং সোনার মত, পান চিবুচ্ছেন, হাতে পুঁথি, দেখতে ভারি চমৎকার হ'য়েছে।

হঠাৎ শ্রীবাস পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা। নিমাই তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন। তিনিও নিমাইকে আশীর্ব্বাদ করলেন। তিনি নিমাইয়ের পিতৃবন্ধু, সুতরাং বৃদ্ধ। নবদ্বীপে তাঁকে সকলেই শ্রদ্ধা করে; তিনি পরম ভক্ত।

তিনি বললেন—"নিমাই, তোমাকে একটা কথা বলবার ইচ্ছা হ'য়েছে অনেকদিন। আজ তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে ভালই হ'ল। কথাটা শোন। বলি ব্যাকরণ শিখেছ, শুধু ব্যাকরণ কেন, অনেক শাস্ত্রই তুমি প'ড়েছ, যথেষ্ট জ্ঞানলাভও ক'রেছ, চারদিকে খুব নামও হ'য়েছে। আচ্ছা বলত জগতে কি শুধু পণ্ডিত হওয়ার জন্যই এসেছ?"

নিমাই অমনি উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে মূর্খ হওয়ার জন্য ত মানুষ জগতে আসে নি।"

শ্রীবাস বললেন—"তা আসে নি নিশ্চয়ই। তুমিও জ্ঞানলাভ ক'রেছ, কিন্তু ভেবে দেখ দেখি এ জ্ঞান তুচ্ছ কিনা।"

নিমাই বললেন—"জ্ঞান লাভ করা তুচ্ছ হবে কেন?"

শ্রীবাস উত্তর করলেন—"সত্যিকার জ্ঞানলাভ করা তুচ্ছ নয় নিশ্চয়ই, মানুষ মাত্রেরই সেই জন্য চেষ্টা করা উচিত, নইলে সে মানুষ কিসে?"

নিমাই উত্তর দিলেন—"আমিই বা মিথ্যা জ্ঞানলাভের কি চেষ্টা ক'রেছি?"

শ্রীবাস বললেন—"ভগবানের চিন্তায়, তাঁকেই পাওয়ার জন্য সর্ব্বস্ব ছেড়ে সাধনায় তন্ময় হ'য়ে থাকাই হচ্ছে জ্ঞান। ভক্তি যাঁর আছে তিনিই জ্ঞানী। শুধু কতকগুলো বই প'ড়েই কি জ্ঞানী হওয়া যায়?"

নিমাই বললেন—"আপনি যা বলছেন বুঝতে পেরেছি। আমার বয়েস এখনও বেশী হয় নি, আরও কিছুদিন যাক, বয়েসটা একটু পাকুক, তখন বৈষ্ণব হওয়ার চেষ্টা করা যাবে। যদি হই এমন বৈষ্ণব হ'ব, যে, সকলে আমার কাছে হার মানবেন।"

এই কথা ব'লেই তিনি হো হো ক'রে হাসতে লাগলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত ভাবলেন, আচ্ছা লোককেই উপদেশ দিতে এসেছি বটে। বিদ্বান হ'লেও নিমাইটা ভারী ছ্যাব্‌লা। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা নিমাই, তুমি কি দেবতাও মান না নাকি?"

নিমাই উত্তর দিলেন—"মানুষই দেবতা, আমিই দেবতা, আবার কোন্ দেবতা মানবো বলুন তো?"

জবাব শুনে শ্রীবাস ত হতভম্ব। আর বেশী কথা কওয়া বৃথা মনে ক'রে তিনি আস্তে আস্তে সেখান থেকে চ'লে গেলেন। মনটা তাঁর বড়ই খারাপ হ'য়ে রইল। বন্ধুর ছেলে নিজের ছেলেরই মত, তাকে উপদেশ দিতে এসে শেষে এমন কথাও শুনতে হ'ল! হায় রে কপাল!

লক্ষ্মীদেবীর সর্পাঘাত

শচীদেবীর মনে বড় দুঃখ। স্বামী নেই, জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হ'য়ে চ'লে গেছেন। ঘর সংসার একেবারে ফাঁকা, মনে আর শান্তি নেই, শুধু এক নিমাইয়ের মুখের দিকে চেয়েই তিনি সংসার চালাচ্ছেন কত অভাবের ভিতর দিয়ে।

নিমাই টোল ক'রেছেন, বড় হ'য়েছেন; এখন বিয়ে দিয়ে একটি বৌ এনে নিজে মানুষ করবেন, সংসারের সমস্ত ভার তার ওপরে দিয়ে একটু বিশ্রাম নেবেন, এই ছিল শচীদেবীর একমাত্র আশা।

তাঁর আশা পূর্ণ করবার জন্য ঘটক লেগে গেলেন, এরই ফলে নবদ্বীপের বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে নিমাইয়ের বিয়ে হ'য়ে গেল। এবার শচীদেবী একটু শান্তি পেলেন।

কিছুদিন পরেই নিমাইয়ের একান্ত ইচ্ছা হ'ল পূর্ব্ববঙ্গে যেতে। মা কিছুতেই ছেড়ে দিতে রাজী হন না। মাকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, লক্ষ্মীদেবীকে তাঁর সেবার জন্য তাঁরই কাছে রেখে, কয়েকজন শিষ্য নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন পূর্ব্ববঙ্গের দিকে। এই ভ্রমণের উপলক্ষে তিনি তাঁর পৈতৃক বাড়ী শ্রীহট্টেও গিয়েছিলেন।

নিমাই ব্যাকরণের টিপ্পনী লিখেছিলেন। তা শুধু নবদ্বীপের

ছাত্রদের মধ্যেই নয়, পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রদের মধ্যেও বহুল প্রচারিত হ'য়েছিল; কাজেই তাঁরা নিমাইয়ের নাম জানতেন, এবার তাঁর দর্শন লাভ ক'রে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হ'লেন।

পূর্ব্ববঙ্গে গিয়ে নিমাইয়ের এক ভাবান্তর উপস্থিত হ'ল। তিনি ভাল, মন্দ, পতিত, অধম কত লোককেই যে হরিনামে উন্মত্ত ক'রে দিলেন তার সংখ্যা নেই।

এমনি ক'রে কয়েকমাস কাটিয়ে নিমাই একদিন সন্ধ্যার সময় নবদ্বীপে ফিরে এলেন। সঙ্গে বহু জিনিষপত্র এনেছিলেন, মায়ের চরণে রেখে বললেন—"মা, ভাল ক'রে রান্না কর। গঙ্গাস্নান ক'রে আসছি।"

খাওয়া-দাওয়া সেরে বাইরে এসে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে নিমাই ব'সে পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণের গল্প বলতে লাগলেন। খানিকক্ষণ গল্প-গুজব ক'রে তিনি বাড়ীর ভিতরে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে দু'চারজন অতি নিকট-আত্মীয়ও গেলেন। গিয়ে দেখলেন শচীদেবীর মুখখানি কাঁদ-কাঁদ। নিমাই জিজ্ঞেস করলেন—"মা, এতদিন পরে তোমার কাছে ফিরে এসেছি, এতে তোমার আনন্দ হওয়ারই কথা, কিন্তু অত বিমর্ষ হ'য়ে র'য়েছ কেন বল দেখি মা?"

শচীদেবী আর সামলাতে পারলেন না, কেঁদে ফেললেন।

নিমাই বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন—"কাঁদছ কেন মা? কি হ'য়েছে বল ত।"

সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা তখন বললেন—"কাঁদবারই কথা বটে নিমাই। এমন লক্ষ্মীর মত বৌকে সাপে কামড়ালে, কিছুতেই তাঁর প্রাণ রক্ষা করা গেল না।"

নিমাই বুঝতে পারলেন লক্ষ্মীদেবী আর নাই, সর্পাঘাতে তাঁর মৃত্যু হ'য়েছে।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ধৈর্য্য ধারণ ক'রে মাকে বললেন—"দুঃখ ক'রো না মা, স্বামীকে রেখে যে স্ত্রী দেহত্যাগ করে সে ভাগ্যবতী। তুমি একথা নিশ্চয়ই জান। কাজেই তোমার আর শোক করা উচিত নয়।"

তাঁর নানারকম প্রবোধ বাক্যে শচীদেবী কিছু সান্ত্বনা লাভ করলেন।

নিমাই আবার চৌপাঠীতে ব্যাকরণ পড়াতে লাগলেন। এবার তাঁর ছাত্রও হ'ল অনেক বেশী। পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণের ফলে সেখান থেকে বহু ছাত্র আসতে লাগল। নবদ্বীপের অধিবাসীরা তখন বুঝতেও পারে নি যে, চঞ্চল নিমাই কি ক'রে গোপনে গোপনে সারা পূর্ব্ববাংলা জয় ক'রে এসেছেন। পূর্ব্বেও তিনি যেমন চঞ্চল ছিলেন ফিরে এসেও তেমনি চঞ্চলই রইলেন। তাঁর নাম পূর্ব্ববাংলা ছেয়ে ফেলেছে, বহু লোকই তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত হ'য়ে প'ড়েছিলেন, কিন্তু তিনি আর কোন দিন পূর্ব্ববঙ্গে ফিরে যান নি।

ঈশ্বরপুরী

মস্ত এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এসেছেন নবদ্বীপে। তাঁর নাম ঈশ্বরপুরী। তখন ত নবদ্বীপে সাধু পুরুষের অভাব ছিল না। অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় হ'ল, চারদিকেই তাঁর খুব খাতির হ'তে লাগল।

ঈশ্বরপুরী যে শুধু সাধু পুরুষ ছিলেন তাই নয়, মস্ত কবিও ছিলেন। তিনি "শ্রীকৃষ্ণলীলা" নামে একখানা সংস্কৃত কাব্য লিখেছিলেন।

একদিন নিমাইয়ের সঙ্গে পথে তাঁর দেখা হ'ল। নিমাই তাঁকে প্রণাম করলেন। নিমাই পণ্ডিতের নাম তাঁর জানা ছিল, পূর্ব্বে কখনো তাঁকে দেখেন নি। দেখেই তিনি স্তম্ভিত। একদৃষ্টে নিমাইয়ের পা থেকে মাথা অবধি দেখতে লাগলেন। তাঁর এইভাব দেখে নিমাই হেসে বললেন—"আজ দয়া ক'রে আমার বাড়ীতে ভিক্ষে করতে যাবেন, তা হ'লে আমাকে সারাদিনই দেখতে পাবেন।"

কথাটা শুনে ঈশ্বরপুরীও হাসলেন। তিনি সন্ন্যাসী, ভিক্ষাই তাঁর প্রাণ ধারণের অবলম্বন। ভিক্ষা করার জন্য আহ্বান করার অর্থ ভোজন করাবার জন্য নিমন্ত্রণ করা। ঈশ্বরপুরী খুব আনন্দের সহিত নিমাইয়ের ঘরে ভিক্ষা করলেন।

নিমাইয়ের সঙ্গে তাঁর এই প্রথম পরিচয়, তাঁদের মনে হ'ল যেন তাঁরা কত কালের পরিচিত। সেই দিন থেকে প্রত্যহ ঈশ্বরপুরী তাঁর "শ্রীকৃষ্ণলীলা" পাঠ করেন আর নিমাই শোনেন।

ঈশ্বরপুরী নিমাইকে বললেন—"পণ্ডিত, ভাল ক'রে শোন, কোথায় কি দোষ বা ভুল হ'য়েছে তোমায় বলতে হবে। আমি শুধ্‌রে নেব।"

নিমাই বললেন—"একে ত শ্রীকৃষ্ণের কথা, তা আবার আপনার মত ভক্তের বর্ণনা, এতে দোষ ধরে এমন সাহস কার আছে বলুন ত?"

ঈশ্বরপুরী বললেন—"না পণ্ডিত, তোমাকে সরলভাবে বলতেই হবে। আমি ত ভারি ভক্ত!"

নিমাই বললেন—"ভগবান দেখেন মন, কারও বিদ্যা দেখেন না। প্রাণ দিয়ে, মন দিয়ে যা লিখবেন তাও তাঁরই কাজ। প্রাণ থাকলেই হ'ল, তাতেই তিনি প্রীতি লাভ করেন। লেখায় দোষ থাকলেই বা কি এসে যায়?"

নিমাই বইখানির সমালোচনা করতে রাজী হলেন না। আসল কথা হচ্ছে এই, প্রকৃত খাঁটি লোক যিনি, বিদ্যার অভিমান বা অহঙ্কার যাঁর বিন্দুমাত্র নেই, তাঁর সঙ্গে তিনি তর্ক করতেন না, তাঁকে পরাজয় করবার কোন চেষ্টা করতেন না। তিনি জব্দ করতেন সেই সব পণ্ডিত ও ভক্তকে যাঁদের অহঙ্কার থাকত, ভণ্ডামি থাকত। ঈশ্বরপুরী ছিলেন একজন সত্যিকার সাধু পুরুষ, সুতরাং তাঁর লেখার ভুল ধ'রে তাঁর প্রাণে ব্যথা দিতে তিনি কিছুতেই রাজী হ'লেন না।

দু'চার দিন কেটে গেল। ঈশ্বরপুরী আবার বইখানার কথা তুললেন এবং সমালোচনার জন্য নিমাই পণ্ডিতকে বিশেষ অনুরোধ করলেন।

নেহাৎ এড়াতে না পেরে নিমাই বললেন—"আপনার বইখানা খুব ভালই হ'য়েছে।"

ঈশ্বরপুরী বললেন—"তা যেন হ'ল, কিন্তু কি কি দোষ হ'য়েছে বল।"

নিমাই তখন একটি শ্লোক বের ক'রে দেখালেন যে, ক্রিয়াপদটির ব্যবহার ভাল হয় নি।

ঈশ্বরপুরী কিন্তু ভুল মেনে নিতে রাজী হ'লেন না—যে ক্রিয়াপদটি ব্যবহার ক'রেছেন সেইটিকেই বজায় রাখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

নিমাই ভারি ফ্যাসাদে প'ড়ে গেলেন; তর্ক ক'রে হারিয়ে দিলে ঈশ্বরপুরী খুব দুঃখিত হবেন, তাঁর মনে ত আঘাত দেওয়া যায় না। তার চেয়ে নিজেই হার স্বীকার করা ভাল, এইটি ভেবেই তিনি বললেন—"আপনি যা বলছেন তাই ঠিক বটে।"

বিনাপয়সায় বাজার

নিমাই পণ্ডিত তাঁর ছাত্রদের বললেন—"বাজারে যাই চল, অনেক জিনিষ আনতে হবে, ঘরে কিছুই নেই।"

ছাত্ররা বললেন—"টাকা-পয়সা নিন, চলুন।"

নিমাই বললেন—"টাকা-পয়সা কি কিছু আছে? একটা কানা কড়িও নেই। দেখা যাক যদি দুটো মিষ্টি কথা ক'য়ে কিছু আনতে পারি।"

তিনি প্রথমেই গিয়ে ঢুকলেন এক পানওলার দোকানে। দোকানদার খুব আদর ক'রে তাঁকে বসিয়ে বললেন—"ঠাকুর, একটু বসুন, আমি একটি খুব ভাল খিলি তৈরি ক'রে দিচ্ছি।"

নিমাই চুপ ক'রে ব'সে আছেন। পানওলা তাঁর হাতে পানের খিলি দিলে। একটু হেসে তিনি পানটি মুখে দিয়ে বললেন—"তুমি ত পান দিলে, কিন্তু আমার কাছে ত একটি কড়িও নেই।"

পানওলা বললে—"দাম লাগবে না ঠাকুর। আপনি খেলেন এতেই আমার আনন্দ।"

নিমাই এবার হাসতে হাসতে ছাত্রদের নিয়ে ঢুকলেন এক তাঁতীর দোকানে। দোকানদার প্রণাম ক'রে তাঁকে বসালেন। তিনি বললেন—"এক জোড়া কাপড় দেখাও ত।"

দোকানদার অনেক কাপড় দেখালে। নিমাই এক জোড়া হাতে ক'রে বললেন—"এই কাপড় ঠিক আমার মনের মত, এর দাম কত? আর দাম জিজ্ঞেস ক'রেই বা কি করব, হাতে ত একটি পয়সাও নেই।"

দোকানদার বললে—"ঠাকুর, দামের জন্য চিন্তা কি? এখন না থাকে পরে দেবেন।"

নিমাই বললেন—"ধারে কিনতে চাই না।"

দোকানদার তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। কি মুখ, চোখ, যেন একটা তেজ ফুটে বেরোচ্ছে। এমন ব্রাহ্মণকে যদি এক জোড়া কাপড় অমনিই দেয়া যায়, তাতে মঙ্গলই হবে, এই ভেবে বললে—"ঠাকুর, আপনি কাপড় নিয়ে যান, দাম লাগবে না। আপনাকে দিলে আমার মঙ্গল হবে।"

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ছাত্রদের কাপড় দেখিয়ে নিমাই খুব হাসতে লাগলেন।

এমনি ক'রে ক্রমে ক্রমে তিনি অনেক জিনিষ কিনলেন। ছাত্ররা সেগুলো ব'য়ে নিয়ে এলেন।

নিমাইয়ের একটা অদ্ভুত মোহিনী শক্তি ছিল। তাঁর মধ্যে এমন এক বস্তু ছিল যে, সকলকেই তাঁর কাছে মাথা নোয়াতে হ'ত। কি অপরূপ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যই তাঁর ছিল, সারা জগৎই তাঁর বশ হ'য়েছিল এই জন্য।

শ্রীধর নামে ছিল এক দোকানী। বাজারে থোড়, মোচা আর কলার খোলার পাত্র বিক্রি ক'রে যা দু'চার পয়সা হ'ত তা-ই দিয়ে সে কোন রকমে সংসার চালা'ত। লোকটি ছিল বৈষ্ণব। তার ওপর নিমাইয়ের বড়ই আক্রোশ। কাজেই নিমাইকে দেখতে পেলেই তার মুখ শুকিয়ে যেত।

নিমাই বাজারে গিয়েই শ্রীধরের কাছে উপস্থিত। শ্রীধর তাঁকে দেখেই বললে—"ঠাকুর, পষ্ট কথা বলছি—আমি যে দাম বলব তার কমে কিছুতেই দেবো না, ইচ্ছা হয় নেবেন, না হয় অন্য জায়গায় যাবেন।"

নিমাই বললেন—"শ্রীধর, তুমি ভারি কৃপণ, তোমার অনেক টাকা আছে।"

শ্রীধর বললে—"তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুর, ঝগড়া ক'রো না, তোমার পায়ে পড়ি। আমি নিতান্ত গরীব, টাকা পা'ব কোথায় ঠাকুর?"

"আচ্ছা, তুমি যা বললে তার আদ্ধেক দাম দিচ্ছি।"—ব'লেই যেমনি নিমাই জিনিষে হাত দিলেন, অমনি শ্রীধর ব'লে উঠল—"অন্য জায়গায় যান, ঠাকুর।"

নিমাই বললেন—"আমার হাত থেকে জিনিষ কেড়ে নিয়ে তুমি কি ভাল কাজ কচ্ছ শ্রীধর? তুমি দেবতাকে প্রত্যহ কত জিনিষ অমনি দাও, আমায় না হয় কম দামেই দিলে।"

শ্রীধর তবু বললে—"দাম কমা'ব না ঠাকুর, আমি হার মানছি, যদি না ছাড়, রোজ একখণ্ড থোড় আর খাবার জন্য খোলার পাত্র অমনি তোমাকে দেবো।"

নিমাই বললেন—"বেশ, এই কথাই রইল।"

শ্রীধর তার কথা ঠিক রেখেছিল।

বিষ্ণুপ্রিয়ার আগমন

শচীদেবী প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যান আর দেখেন যে, একটি মেয়ে যেন তাঁরই প্রতীক্ষায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। ভারি চমৎকার মেয়েটি ; দেখতে যেমন সুন্দর, স্বভাবটিও তেমনি ভারি মিষ্টি। তাঁর কেবলই মনে হয়, যদি এমনি একটি মেয়ের সঙ্গেই নিমাইয়ের বিয়ে হয়! এমন একটি বৌ ঘরে থাকলে তাঁর প্রাণটা বুঝি বা একটু ঠাণ্ডা হ'ত।

মেয়েটি তাঁকে রোজই প্রণাম করে, আর তিনিও তাঁকে আশীর্বাদ ক'রে স্নান-আহ্নিক সেরে বাড়ী আসেন।

কয়েকদিন এমনি ক'রেই কেটে গেল। একদিন শচীদেবী জিজ্ঞেস করলেন,—"মা, তোমার নাম কি ?"

মেয়েটি উত্তর করলে—"আজ্ঞে আমার পিতার নাম শ্রীসনাতন মিশ্র।"

শচীদেবী বললেন—"আমি তোমার নামটিই জানতে চাই।"

মেয়েটি বললে—"আমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া।"

শচীদেবী বললেন—"বাঃ কী সুন্দর নামটি তোমার! সুখে থাক মা, বিষ্ণুর মতই তোমার বর হোক, সত্যিই বিষ্ণুর প্রিয়া হও।"

বিষ্ণুপ্রিয়া মাথা হেঁট ক'রে আস্তে আস্তে চ'লে গেলেন, আর শচীদেবীও বাড়ীতে ফিরে এলেন; কিন্তু ভাবতে লাগলেন—বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে নিমাইয়ের বিবাহ হ'তে পারে কিনা। সনাতন মিশ্র রাজপণ্ডিত, খুব অবস্থাপন্ন; আর নিমাই পিতৃহীন, নিতান্ত দরিদ্র। বিবাহের প্রস্তাব ক'রে পাঠানো যাক্, তারপর যা হয় হবে, এই ভেবে তিনি ঘটক পাঠালেন। ঘটক গিয়ে ত সনাতন মিশ্রের কাছে প্রস্তাব করলেন।

মিশ্র মশায় মহা খুসী। তিনি ত স্বপ্নেও ভাবেন নি যে, বিনা আয়াসে তাঁর মেয়ের এমন বরের সঙ্গে বিয়ে হবে। নিমাইয়ের মত ছেলে পাওয়া কি সোজা কথা? দিগ্বিজয়ী কেশব পণ্ডিতকে পরাজিত করায় তাঁর নাম তখন চারদিকে ছড়িয়ে প'ড়েছে; সারা নবদ্বীপ খুঁজেও নিমাইয়ের মত মেধাবী যুবক পাওয়া যায় না। মিশ্র মশায় খুব আনন্দের সহিত রাজি হ'লেন। কাজেই কথা পাকা ক'রে ঘটক ফিরে এলেন।

বিবাহের শুভ লগ্ন স্থির করবার জন্য সনাতন মিশ্র এক গণককে ডেকে পাঠালেন। গণক আসছেন এমন সময়ে পথে তাঁর সঙ্গে নিমাইয়ের দেখা। নিমাইকে দেখেই গণক জিজ্ঞেস করলেন—"বল ত কোথায় যাচ্ছি?"

নিমাই বললেন—"তা আমি কি ক'রে বলব?"

গণক। "যাচ্ছি সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে বিয়ের দিন স্থির করতে।"

নিমাই। "কার বিয়ে?"

গণক। "তোমার বিয়ে।"

নিমাই। "আমার বিয়ে! কই আমি ত কিছুই জানি না।"

তাঁর কথার ভাবে ঘটক মনে করলেন যে, এ বিবাহে তাঁর মত নেই; পণ্ডিত লোক, বড় হ'য়েছেন; কাজেই নিজে ভাল ক'রে না জেনে শুনে বোধ হয় বিবাহ করবেন না। নানা কথা চিন্তা ক'রে গণক ঠাকুর সনাতন মিশ্রের বাড়ী গেলেন এবং তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, নিমাইয়ের এ বিয়েতে মত নেই।

মিশ্রের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তাঁর এবং তাঁর বাড়ীর সকলের এত আনন্দ, এত আশা এক মুহূর্তেই চুরমার হ'য়ে গেল।

তাঁর এই দুঃখের কথা ক্রমে নিমাই পণ্ডিতের কানেও গেল। নিমাইয়ের ভারি দুঃখ বোধ হ'ল, কারণ তাঁর জন্যই মিশ্র মশায়ের এই দুঃখ, কাজেই আর বিলম্ব না ক'রে তিনি মিশ্রের বাড়ীতে খবর পাঠালেন যে, তিনি এই বিয়েতে রাজী আছেন।

খুব ধূমধামে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে নিমাইয়ের বিয়ে হ'ল। বাসর-ঘরে যাওয়ার সময় বিষ্ণুপ্রিয়ার পায়ে লাগল এক হোঁচট, ঝর-ঝর ক'রে রক্ত পড়তে লাগল; নিমাই অমনি তাঁর নিজের পা দিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার পা টিপে ধরলেন।

নিমাইয়ের ভাবান্তর

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ীতে নিমাই পণ্ডিতের টোলের কয়েকজন পড়ুয়া জড় হ'য়েছে।

খানিকক্ষণ পরে গঙ্গাদাস বেরিয়ে আসতেই পড়ুয়ারা তাঁকে প্রণাম ক'রে বললে—"আপনার কাছে একটি বিশেষ দরকারে এসেছি। নিমাই পণ্ডিত আমাদের অধ্যাপক। তাঁর মত পণ্ডিত কোথাও নেই, আর আমরাও তাঁকে ঠিক দেবতার মত ভক্তি করি। তিনিও আমাদের অত্যন্ত যত্ন ক'রেই পড়ান। আমরা নানা জায়গা থেকে বহু কষ্ট স্বীকার ক'রে তাঁর কাছে পড়বার জন্যই এসেছি। কিন্তু গয়া থেকে ফিরে এসে অবধি তিনি পড়ানো একেবারে ছেড়েই দিয়েছেন।"

গঙ্গাদাস জিজ্ঞেস করলেন—"নিমাই কি টোলে যান না, তোমাদের পাঠ দেন না?"

পড়ুয়ারা বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি টোলে আসেন বটে, কিন্তু পাঠ দেন না, কেবল বলেন—কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ ভজ।"

গঙ্গাদাস বললেন—"তাই ত! তোমরা এসেছ শাস্ত্র পাঠ করতে, ধর্ম্মের বক্তৃতা শুনলে ত চলবে না।"

পড়ুয়ারা বললে—"আপনি একবার তাঁকে ডেকে ব'লে দিলে বোধ হয় তিনি আমাদের ভাল ক'রে পাঠ দেবেন।"

গঙ্গাদাস হো হো ক'রে হেসে উঠে বললেন—"নিমাই এরই মধ্যে একেবারে মস্ত সাধু হ'য়ে গেছে দেখছি। তোমরা তাঁকে আজ বিকেলে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস, ভাল ক'রে ব'লে দেবো।"

বিকেলবেলা ছাত্রদের নিয়ে নিমাই গিয়ে উপস্থিত হ'লেন গঙ্গাদাসের বাড়ী। প্রণাম করতেই গঙ্গাদাস্ মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে বললেন,—"নিমাই, আমি তোমাকে অতি যত্নের সহিত পড়িয়েছি, তুমিও আমাকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ক'রেছ, কারণ আজ তোমার নাম সারা দেশে ছড়িয়ে প'ড়েছে, তোমার ব্যাকরণের টিপ্পনী বাংলা দেশের সর্ব্বত্র আদর পেয়েছে। তুমি এমন অধ্যাপক হ'য়েছ যে, তোমার ছাত্রেরা তোমাকে দেবতার মত ভক্তি করে, আর কারও কাছে পড়তে চায় না। তোমার নাম শুনে তোমার কাছেই তা'রা এসেছে। এ অবস্থায় তাদের পড়ানো ছেড়ে দিয়ে তুমি নাকি মস্ত হরিভজা হ'য়েছ? এ সব পাগলামি ছেড়ে দাও। মাথা ঠাণ্ডা ক'রে বেশ মন দিয়ে পড়াও। আমার কথা শোন, আর ওরকম ক'রো না।"

নিমাই অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে বললেন,—"আমায় ক্ষমা করুন। এবার থেকে আমি ভাল ক'রে পড়া'ব।"

গয়াতে গিয়েই নিমাইয়ের সমস্ত প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। ভাবের আবেশে তিনি বার বার জ্ঞানহারা হ'য়ে যেতে লাগলেন। পরম ভক্ত ঈশ্বরপুরী তাঁর কানে মন্ত্র দিলেন। মন্ত্র পেয়েই তিনি আত্মহারা হ'য়ে গেলেন।

নবদ্বীপে ফিরে এসে নিমাই পণ্ডিত বহুদিন পর টোলে পড়াতে গেলেন। শত শত ছাত্র এসে উপস্থিত। বহুদিন পর ছাত্ররা হরি হরি ব'লে জোর দিয়ে বাঁধা পুঁথি খুললেন। হরিনাম শুনেই নিমাইয়ের ভাবান্তর হ'ল। ব্যাকরণ যেমনি খোলা ছিল তেমনি খোলাই রইল। ভাবের আবেশে তিনি ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগলেন।

খানিক পরে তাঁর হুঁস্ হ'ল, বড়ই লজ্জা পেলেন। ছাত্রদের বললেন,—"আজকে আর হ'ল না, কালকে থেকে পাঠ আরম্ভ করব।"

পরদিনও ঠিক এই ভাবেই কাটল, পড়ানো আর হ'ল না।

তারপর দিনও ঐ একই ভাব। তাঁর মুখের কথা শুনতে ছাত্রদের বড়ই ভাল লাগে, তাই ভক্তির কথা তাঁরা তন্ময় হ'য়েই শোনেন। নিমাই জিজ্ঞেস করলেন—"তোমরা সত্যি ক'রে বল ত, আমি তোমাদের কি রকম পড়াচ্ছি ?"

ছাত্ররা সব চুপ ক'রে রইলেন।

নিমাই আবার জিজ্ঞেস করলেন,—"তোমরা প্রাণ খুলে সত্যি কথা বল। আমার মনে হচ্ছে পড়ানো হচ্ছে না।"

তখন একজন ছাত্র বললেন,—"আপনার পড়ানো এত ভাল হয় যে, আমরা মুগ্ধ হ'য়ে যাই, আপনার মত সুন্দর ব্যাখ্যা আর কোন অধ্যাপক করতে পারেন না। কিন্তু গয়া থেকে এসে অবধি এক দিনও সচেতন অবস্থায় পুঁথির অর্থ করেন নি। কাজেই আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি তার কিছুই হচ্ছে না। আমরা যে পাঠ জিজ্ঞেস করি তা'তেই আপনি হরিগুণ ব্যাখ্যা করেন।"

নিমাইয়ের ভারি লজ্জা হ'ল ; বললেন—"দেখ ভাই সব, আমার

যে কি হ'য়েছে বুঝতে পারি না। হরিগুণ ব্যাখ্যা করা ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না। আচ্ছা আমার কি বায়ুরোগ হ'ল না কি?"

ছাত্ররা বললেন—"না, না, আপনার বায়ুরোগ হবে কেন? আপনি পরম ভক্ত, তাই ভক্তিতে তন্ময় হ'য়ে যান। বায়ুরোগই হ'ত যদি তবে কি আপনার প্রত্যেকটি কথা আমাদের এত মিষ্টি লাগত?"

নিমাই বললেন—"তোমরা আমার নিতান্ত আপনার জন, তোমাদের কাছে কোন কথা বলতে আমার লজ্জাও নেই, সঙ্কোচও নেই। একটা কথা আজ তোমাদের আমি বলি। রোজই পড়াতে আসবার সময় মনে মনে স্থির করি, আজ খুব ভাল ক'রে পড়া'ব। কিন্তু কি আশ্চর্য! তখনই দেখতে পাই শ্যামবর্ণের একটি পরম সুন্দর শিশু আমার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাচ্ছেন। সেই বাঁশীর সুরে আমার বুদ্ধি লোপ হয়, শরীর অবশ হয়। সে যে কি বুঝতে পারি না।"

ছাত্রদের সেদিনও আর পড়ানো হ'ল না।

দিনের পর দিন এমনি ভাবেই কাটে ব'লে কতক ছাত্র পরামর্শ ক'রে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে গিয়েছিলেন। ভাল ক'রে পড়াবেন ব'লে নিমাইও গঙ্গাদাসকে কথা দিয়ে এসেছিলেন।

ঠিক তার পরদিন ভোরবেলা ছাত্ররা দেখলেন নিমাই পণ্ডিত টোলে অধ্যাপকের আসনে ব'সে আছেন ধ্যানস্থ হ'য়ে। তাঁর মুখ থেকে, দেহ থেকে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে, দুই চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়ছে। মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল! ছাত্ররা নিঃশব্দে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন আর ভাবলেন তাঁদের অধ্যাপক তাঁদের মত মানুষ নন, নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ।

পাঠ জিজ্ঞেস করতে আর কোন ছাত্রেরই প্রবৃত্তি হ'ল না, সকলে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

একটু চেতনা পেয়েই নিমাই বললেন—"ভাই সব, এমনি ক'রে আর কতদিন তোমাদের ফাঁকি দেবো ? তোমাদের কাছে আমি ভিক্ষা চাই, দয়া ক'রে আমায় তোমরা মুক্তি দাও। আমি আর পড়াতে পারব না। তোমাদের ত ব'লেছি ভাই, যত বার পড়া'ব ভাবি, তত বারই সেই [illegible] বাঁশী শুনি। বাঁশীর সুর যে আমায় পাগল ক'রে দেয়। আর পারি না। আমি সরল মনে তোমাদের অনুমতি দিচ্ছি, যাঁর কাছে ইচ্ছে তাঁর কাছে গিয়ে পাঠ কর, আমায় মুক্তি দাও।"

এই ব'লেই নিমাই কাঁদতে লাগলেন। ছাত্ররা তাঁর কান্না দেখে আর ধৈর্য্য ধারণ করতে পারলেন না, সকলেই কাঁদতে লাগলেন। কথা কওয়ার শক্তি কারো নেই, সকলেই অবশ।

একজন ছাত্র অতি কষ্টে বললেন—"গুরুদেব, আপনাকে ছেড়ে আর কার কাছে পড়তে যা'ব ? পড়ায় আর কাজ নেই, যা শিখেছি [illegible] আজ যে কী ব্যথা আমাদের মনে তা বলতে পারি না। আমরা আপনাকে বিদায় দিতে পারব না। আপনি আমাদের ত্যাগ কচ্ছেন। আমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রে যান।"

বাঁধ ভেঙে গেলে জল যেমন প্রবল বেগে ছোটে, তেমনি ধৈর্য্যের শেষ বাঁধটুকু ভেঙে যাওয়ায় ছাত্রদের কান্নার বেগও প্রবল হ'য়ে উঠল। সকলে গলা ছেড়ে কাঁদতে আরম্ভ করল।

নিমাইয়ের তখন কণ্ঠ রোধ হ'য়েছে, কথা কইবার শক্তি নেই, সকলকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করলেন। একে একে প্রত্যেক ছাত্রকে বুকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন, আর মাথায় হাত

দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। খানিক পরে ধৈর্য্য ধারণ ক'রে বললেন—"ভাই সব, এতদিন ত এক সঙ্গে পড়া-শুনা করলাম, আজ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন ক'রে আমার মনের সাধ পূর্ণ কর।"

ছাত্ররা বললেন—"কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কি ক'রে করব জানি না। শিখিয়ে দিন।"

নিমাই তখন হাতে তাল দিয়ে দিয়ে একটি ছোট কীর্ত্তন শেখাতে আরম্ভ করলেন। তিনি মাঝখানে আর ছাত্ররা তাঁর চারিদিকে ঘিরে ব'সেছেন। সকলেই হাত তালি দিয়ে গান গাইতে লাগলেন, সকলেই আনন্দে মগ্ন। চারদিক থেকে বহু লোক এল, তা'রাও ক্রমে ক্রমে সেই কীর্ত্তনে যোগ দিল। নিমাই তখন বাইরের সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। সকলেই তাঁর ভাব দেখে স্তম্ভিত।

চিরকালই ভগবানকে লাভ করার জন্য যাগ, যজ্ঞ, পূজা, তপস্যা, ধূমধাম প্রচলিত ছিল। কিন্তু নিমাই পণ্ডিতই এই প্রথম প্রচার করলেন যে, ভগবান আনন্দময়, এই আনন্দের মধ্যে দিয়েই তাঁকে লাভ করা যায়। নবদ্বীপে এই প্রথম নামকীর্ত্তনের সৃষ্টি হ'ল।

নিমাই পণ্ডিতের টোল গেল ভেঙে, আর তাঁর অনেক ছাত্র সেইদিন থেকেই হ'লেন তাঁর পরম ভক্ত শিষ্য।

বিপক্ষের ষড়যন্ত্র

শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে রোজ কীর্ত্তন হচ্ছে নিমাইকে নিয়ে। নিমাইয়ের এখন বহু ভক্ত হ'য়েছে। অত্যন্ত বুড়া পণ্ডিত থেকে আরম্ভ ক'রে নিতান্ত তরুণ যুবকও অনেকেই তাঁর শিষ্য। কাজেই কীর্ত্তনের দলও খুব বড় হ'য়েছে।

রোজই শ্রীবাসের বাড়ীতে কীর্ত্তন হয়। খোল বাজে, করতাল বাজে, খুব কোলাহল হয়। বাইরের বহুলোক দেখতে আসে—কিন্তু ঢুকতে পারে না। কীর্ত্তন আরম্ভ হওয়ার আগেই দরজা বন্ধ ক'রে দেয়া হয়, আর একজন ভক্ত দরজায় পাহারা দেন।

রোজই বাইরে লোক জমা হয়, আর 'দরজা খোল' ব'লে সজোরে আঘাত করে; কিন্তু তাদের কথা কেউ শোনে না, আর দরজাও কেউ খোলে না।

লোকের মনে নানা রকমের সন্দেহ হ'ল। একজন বললে—"এ আবার কি ব্যাপার? দরজায় খিল দিয়ে বাড়ীর ভেতরে নেচে গেয়ে ভজন করতে হয়, এ কোন জন্মেও শুনি নি।"

আর একজন বললে—"ভগবান ত হৃদয়ে আছেন, তাঁকে মনে মনে ডাকলেই ত হয়, লোক দেখিয়ে ডাকা কেন বাবা ?"

তৃতীয় জন বললে—"ভগবান মানুষের হৃদয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় র'য়েছেন, চেঁচামিচি ক'রে ডেকে তাঁর ঘুম ভাঙালে কি আর রক্ষা আছে ? একটি গোটা ধানও হবে না, দেশশুদ্ধ লোক না খেয়ে মরবে।"

চতুর্থ জন বললে—"নিমাই পণ্ডিতটা বেশ ভাল লোক ছিল হে, এ আবার কোন নতুন ঢং চালাতে লাগল ?"

পঞ্চম জন বললে—"বাবা বেশী চালাকি মারতে হবে না, মুসলমান রাজা, এ খবর একবার কানে গেলে গ্রামশুদ্ধ লুঠ করবে।"

কয়েকজন বললে—"আরে এত গণ্ডগোলের দরকার কি ? কতক গুলো মাতাল জুটে ত এই হল্লা কচ্ছে, এদের ঘরদোর ভেঙে গঙ্গায় ফেলে দিলেই হয়, এদের জব্দ করতে আবার এত ভাবনা কিসের ?"

একজন বললে,—"বাজে কথা রাখ না বাবা। চল না কালকে কাজী সাহেবের কাছে, বেটাদের জব্দ ক'রে দেই।"

একজন বড় পণ্ডিত বললেন—"দরজায় খিল দিয়ে নিশ্চয়ই এরা কুকাজ করে, নইলে সবই গোপন রাখতে চায় কেন ? সৎকাজ করতে আবার ঢাক্ ঢাক্ গুর্ গুর্ কিসের ?"

অন্য একজন বললে—"আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, এরা মদ, মাংস ইত্যাদি খুব চালাচ্ছে ; লোকে টের পেলে জাত যাবে, তাই এসব কাজ খুব গোপনে করা হচ্ছে, বুঝলেন ?"

কয়েকজন সত্যিই কাজী সাহেবের কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। তা'রা বললে—"কাজী সাহেব, নিমাই পণ্ডিত একটা দল বেঁধে হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট কচ্ছে।"

কাজী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন,—"কি ক'রে ?"

—"নিমাই পণ্ডিত আর তার দল খুব জোরগলায় 'হরি' ব'লে ভগবানকে ডাকে। এর ফলে দেশময় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, কারণ ভগবান আছেন মানুষের হৃদয়ে নিদ্রিত, এত চীৎকারে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হবে। তিনি নিশ্চয়ই ভয়ানক রেগে যাবেন, আর রেগে গেলেই শস্য একেবারেই হবে না।"

কাজী সাহেব বললেন—"আচ্ছা, আপনারা আশ্বস্ত হোন, আমি কীর্তন বন্ধ ক'রে দেবো।"

এদিকে হ'ল কি! মাঘ মাসে নিমাই পণ্ডিত প্রথম কীর্ত্তন আরম্ভ করেন আর চৈত্র মাসের মধ্যেই এই কীর্ত্তন সারা দেশ ছেয়ে ফেললে। অনেক বিখ্যাত লোক দলে যোগ দিতে লাগলেন। নিমাইয়ের দল শক্তি অল্প সময়ের মধ্যেই খুব বেড়ে গেল। চারদিকে শত শত লোক একত্রে হরিনাম কীর্ত্তন আরম্ভ করলে।

কাজী সাহেব কিছুই করলেন না বটে, কিন্তু এদিকে এক গুজব রটে গেল যে, গৌড়ের বাদশা হুসেন সা নিমাই পণ্ডিত ও তাঁর সঙ্গীদের বন্দী করবার জন্য সৈন্যসহ একজন সেনাপতি পাঠাচ্ছেন। শত শত সঙ্গী নিয়ে নিমাই কীর্ত্তনগান করেন, যে শোনে সেই মত্ত হয়। এ অবস্থায় নবাব সৈন্য পাঠিয়ে কীর্ত্তন বন্ধ ক'রেও দিতে পারেন, এমন ধারণা অনেকের তো হ'লই, নিমাইয়ের সঙ্গীদের অনেকেও বিশ্বাস ক'রেছিলেন। অন্যের ত কথাই নাই শ্রীবাস প্রভৃতিরও বিলক্ষণ ভয় হ'য়েছিল।

নিমাই চ'লেছেন সঙ্গীদের নিয়ে গঙ্গার তীরে। পথে দেখা এক অধ্যাপকের সঙ্গে। অধ্যাপক বললেন—"ওহে পণ্ডিত, বেশ ত ঘুরে

বেড়াচ্ছ। শোন নি যে নবাবের সেপাই আসছে নৌকোয় ক'রে তোমাকেই ধরবার জন্যে? সময় থাকতে নবদ্বীপ ছেড়ে পালাও।"

নিমাই বললেন—"সারা দেশটাই ত রাজার, পালাব কোথা? আর পালাবই বা কেন? আপনাদের কাছে ত কোন খাতিরই পাই নি। রাজার কাছে সম্মান পেলে আপনারাও হয়তো আমায় সম্মান দেখাবেন।"

অধ্যাপক বললেন—"কেন শুধু শুধু একটা গোলমাল বাধাবে? তোমার ভালর জন্যই বলছি, পালাও।"

নিমাই উত্তর করলেন—"নবাব গৌড় থেকে সেপাই পাঠিয়ে আমাকে নেবেন, এত বড় সম্মান, এত বড় ভাগ্য ছেড়ে দেবো কিসের জন্য?"

"আচ্ছা, সেপাই ত আসুক, তখন দেখা যাবে,"—ব'লেই অধ্যাপক মশায় চ'লে গেলেন।

নিমাই পণ্ডিতও একটু হেসে আবার চলতে লাগলেন।

নিত্যানন্দ

এক সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত হ'লেন বর্দ্ধমান জেলার একচাকা গাঁয়ে। গৃহস্থ অত্যন্ত আনন্দের সহিত অতিথি সেবা করলেন।

অত্যন্ত তুষ্ট হ'য়ে অতিথি গৃহস্থকে বললেন—"আপনি অতিশয় উদার ও ধার্ম্মিক, তাই আপনার কাছে একটি ভিক্ষে চাই, আশা করি বঞ্চিত হ'ব না।"

—"কি ভিক্ষা দয়া ক'রে বলুন, আমার পক্ষে অসাধ্য না হ'লে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হবেন না।"

সন্ন্যাসী বললেন—"আমি আপনার পুত্রটি ভিক্ষে চাই।"

পুত্রকে ভিক্ষা দেয়া কি সহজ, না সম্ভব? কিন্তু সন্ন্যাসী যখন চেয়েছেন তখন দিতেই হবে, নিশ্চয়ই এই পুত্রদ্বারা কোন মহৎ কাজ হবে, নইলে সন্ন্যাসী চাইবেনই বা কেন?—এই ভেবে বাপ-মা পুত্র ভিক্ষা দিতে রাজী হ'লেন। সন্ন্যাসী সেই নিতান্ত অল্প বয়সের ছেলেটিকে সঙ্গে ক'রে চ'লে গেলেন।

নেহাৎ বালক হ'লেও ছেলেটির অসীম শক্তি ছিল, তপস্যার তেজে তাঁর মুখ উজ্জ্বল, আর আনন্দ তাঁর অফুরন্ত, নিত্য। তাঁর আনন্দ নিত্য ছিল ব'লেই গুরুদেব তাঁর নাম রাখলেন নিত্যানন্দ। তাঁকে নিতাইও বলা হয়।

ক্রমাগত কুড়ি বছর নানা তীর্থ পর্য্যটন ক'রে নিত্যানন্দ গেলেন বৃন্দাবনে। সেখানে তাঁর দেখা হ'ল ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে। ঈশ্বরপুরীই তাঁকে নিমাই পণ্ডিতের কথা বললেন এবং নবদ্বীপে যেতে উপদেশ দিলেন।

নিত্যানন্দ আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করলেন না, ছুটলেন সোজা নবদ্বীপের দিকে।

নবদ্বীপে এসে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী না গিয়ে, তিনি অতিথি হ'লেন নন্দন আচার্য্যের বাড়ীতে।

এদিকে নিমাই পণ্ডিত কয়েকদিন থেকেই কেবল বলছেন— "নবদ্বীপে একজন মহাপুরুষ এসেছেন।"

নিত্যানন্দ যেমনি নবদ্বীপে এলেন নিমাই অমনি তাঁর সহচরদের বললেন—"দেখ, কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি যেন সেই মহাপুরুষ এসেছেন। গিয়ে দেখ ত কোন্ বাড়ীতে তিনি আছেন।"

তাঁরা সমস্ত নগর খুঁজে এসে বললেন—"কই, কোথাও তো তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল না।"

নিমাই বললেন—"তাঁকে দেখবার জন্য যে আমি অস্থির হ'য়ে আছি। এস ত খুঁজে দেখি।"

নিমাই চললেন, তাঁর সঙ্গে ভক্তগণ। তিনি সোজা গিয়ে উঠলেন নন্দন আচার্য্যের বাড়ী। দেখলেন নিত্যানন্দ ব'সে আছেন, ভাবে বিভোর, সমস্ত দেহ, মুখ চোখ আনন্দের আভায় জ্বল্ জ্বল্ কচ্ছে। বয়স ত্রিশ কি বত্রিশ মাত্র। দেখলেই মনে হয় স্বর্গ থেকে এক দেবতা এই মর্ত্ত্যে নেমে এসেছেন।

সশিষ্য প্রণাম ক'রে নিমাই তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিতাই

নিস্পন্দ, নিমাইয়ের দিকে চেয়ে আছেন, যেন নিমাইকে দুই চোখ দিয়ে গিলছেন ; আর নিমাইও নিতাইয়ের দিকে চেয়ে আছেন, চোখে পলক পড়ছে না। যেন কত যুগ যুগান্তরের ভালবাসা। নিমাই দু'হাত দিয়ে নিতাইকে ধ'রে আলিঙ্গন করলেন, দু'জনেরই চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরতে লাগল।

নিতাই কঠোর সন্ন্যাসী, তাঁর দণ্ড আছে, কমণ্ডলু আছে, সন্ন্যাসের সব চিহ্ন আছে। নবদ্বীপে এসে নিমাইয়ের দর্শন হওয়ার পর দণ্ড কমণ্ডলু ফেললেন, সন্ন্যাসের বাইরের চিহ্ন ত্যাগ করলেন।

নিতাইকে নিমাই নিয়ে গেলেন শচীদেবীর কাছে ; বললেন—"মা, এই নাও তোমার আর এক ছেলে। এই আমার দাদা, তোমার বড় ছেলে বিশ্বরূপ।"

শচীদেবী নিতাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন যেন বিশ্বরূপই। ছেলের যোল বছর বয়সের কচি মুখখানি শচীদেবীর চোখের সামনে ভেসে উঠল। চোখ জলে ঝাপসা হ'য়ে গেল। তিনি নিতাইকে জিজ্ঞেস করলেন—"সত্যিই কি তুমি আমার বিশ্বরূপ ?"

নিতাই উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ মা, আমিই তোমার বিশ্বরূপ।"

"আয় বাবা, আমার কোলে আয়" ব'লে শচীদেবী নিতাইকে জড়িয়ে ধরলেন, পরে আবার বললেন—"আমার নিমাই ত ক্ষেপা, সহায়-সম্বল কিছুই নেই তার, তাকে যত্ন করবার, রক্ষা করবার ভার তোমার।"

মা চোখ বুজেই আছেন···এমনি ক'রে তৃতীয় প্রহরও কেটে গেল। [৭১ পৃষ্ঠা]

হরিদাস

যশোহর জেলার এক গ্রামে বাস করেন এক ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী। গ্রামেব নাম বুডন, বনগ্রামের কাছে। ব্রাহ্মণের নাম সুমতি ঠাকুর, আর ব্রাহ্মণীর নাম গৌরীদেবী। তাঁদের হ'ল এক ভারি সুন্দর ছেলে।

ক্ষুদ্র শূন্য সংসার আনন্দে পরিপূর্ণ হ'ল। শিশুর সুমধুর কলরব তাঁদেব কানে অমৃত ঢালতে লাগল। কিন্তু শিশু বা তাঁদের এ আনন্দ বেশীদিন স্থায়ী হ'ল না। শিশুটির মাত্র ছয় মাস বয়সের সময়েই তাঁরা দেহ ত্যাগ কবলেন। সম্পূর্ণ অসহায় সরল শিশু শূন্য ঘরে একলাটি প'ডে রইল।

শিশুর কাতর কান্নায় একজন মুসলমান ও তার স্ত্রীর প্রাণ দয়ায় ও স্নেহে গ'লে গেল। তাঁরা নিরাশ্রয় শিশুকে বুকে ক'রে তুলে নিয়ে এলেন নিজেদের বাড়ীতে। এই সন্তানহীন দয়ালু মুসলমান জনক-জননী সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাকে পালন করতে লাগলেন।

এমনি ক'রে শিশু বড হ'তে লাগল। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই সে হরিভক্ত হ'য়ে উঠল। সে হবিনাম করে এবং নাম ক'রে অত্যন্ত আনন্দ পায়। তার প্রতিপালকের কাছে এটা যে খুব ভাল লাগে না তা খুবই স্বাভাবিক। স্নেহবশতঃ তিনি কত উপদেশ দিলেন এবং ফেরাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না, শেষটায় চলল নানা রকমের গালাগালি, কিন্তু সব চেষ্টাই একে একে ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

শিশু হ'লেন বালক, বালক হ'লেন যুবক। তাঁর মতি-গতি কিছুতেই ফেরাতে না পেরে তাঁর প্রতিপালক বাধ্য হ'য়ে তাঁকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন ; আর তিনিও নির্ব্বিকার চিত্তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। কোন অবস্থায়ই তাঁর দুঃখ নেই, অসন্তোষ নেই, মুখখানা আনন্দের হাসিতে সব সময়েই জল্ জল্ করে। এই নির্ব্বিকার তরুণটিকেই সকলে বলতেন শ্রীহরিদাস ঠাকুর। তিনি মুসলমান [illegible] বটে, কিন্তু হরিভক্ত ছিলেন ব'লেই তাঁর এই নাম।

বিতাড়িত হরিদাস মনে করলেন বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর [illegible] হ'ল। যা কিছু হয়, তাঁর ইচ্ছায়ই হয়, এবং তাতে প্রকৃত [illegible] হয়। তিনি একটুও দুঃখিত হ'লেন না, কিছুমাত্র তাঁর অভিমানও [illegible] না। আনন্দ তাঁর ক'মল না, বরং বেড়েই গেল ; কারণ তিনি ভাবলেন নির্জ্জনে শান্তিতেই থাকবেন ; ভগবানের চিন্তায় আর কোন [illegible] ঘটবে না, দিনরাত একমনে এক প্রাণে হরিনাম করবেন।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে হরিদাস ঠাকুর বনগ্রামের কাছাকাছি বেনাপোল গ্রামের জঙ্গলে নির্জ্জন কুটীরে বাস ক'রে রোজ তিন লক্ষ হরিনাম জপ করতে লাগলেন। দিনান্তে একবার কুটীর থেকে বেরিয়ে গ্রামের ভিতর যেতেন এবং সামান্য কিছু ভিক্ষা ক'রে এনে তাই খেয়ে বেঁচে থাকতেন। তাঁকে সাধুপুরুষ মনে ক'রে দু'চার জন লোক তাঁর কুটীরে যেতে লাগলেন। তিনি সকলকেই এক উপদেশ দিতেন, 'হরিনাম কর, হরিনাম কর।'

[illegible] মধ্যে তাঁর খুব সম্মান হ'ল। প্রকৃত সাধুপুরুষ ব'লে তাঁকে অনেকেই ভক্তি করতে লাগল। কিন্তু বেনাপোলের জমিদার রামচন্দ্র খানের বড়ই সন্দেহ হ'ল তাঁর উপর। তিনি ভাবলেন

কত লোকই ত সন্ন্যাসীর বেশ ধ'রে, ধর্ম্মের উপদেশ দিয়ে, লোক ভুলিয়ে মহাপুরুষ হওয়ার চেষ্টা করে। শেষে তাদের ভণ্ডামি ধরা পড়ে। কাজ হাসিল করবার জন্য কত লোক কত কি করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সন্ন্যাসীর বেশধারী ভণ্ডরা কপটাচারী। সংসারের নানা প্রলোভনই মানুষকে সব সময়েই যেন হা ক'রে গিলতে আসে। তার মাঝখানে অচল অটল ভাবে একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের চিন্তায়, মানুষের কল্যাণ চিন্তায় তন্ময় হ'য়ে থাকা ক' জনের পক্ষে সম্ভব? এই জন্যই প্রকৃত মহাত্মার প্রতিও অনেকের মনেই একটা অবিশ্বাস আসতে পারে। রামচন্দ্র খান অবিশ্বাস ক'রে অন্যায় করেন নি, কিন্তু এক মহাপাপ ক'রেছিলেন আর একটি কাজ ক'রে।

হরিদাস ঠাকুরকে পরীক্ষা করবার জন্য তিনি তাঁর কাছে পাঠালেন একটি অতি খারাপ স্বভাবের স্ত্রীলোককে।

সন্ধ্যা হ'য়েছে। জঙ্গলের মধ্যে নির্জ্জন কুটীরে সাধু ভগবানের নামে বিভোর।

স্ত্রীলোকটি গ্রাম থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে কুটীরের দরজায় ব'সেছে। ক্রমে রাত্র বাড়ে। এক প্রহর হ'য়ে গেল, সন্ন্যাসী চোখ বুজেই আছেন; দুপুর হ'ল, তিনি নড়েনও না, চোখও খোলেন না। এমনি ক'রে তৃতীয় প্রহরও কেটে গেল। কই? ঠাকুর যেমনি ছিলেন তেমনিই ত রইলেন। ভোর হ'য়ে গেল। গেল সেদিন। এমনি ক'রে আরও একদিন গেল। তৃতীয় রাত্রিতে স্ত্রীলোকটির ভারি অনুতাপ হ'ল। এমন একজন মহাপুরুষকে ছলনা করবার চেষ্টা করা! এ পাপের ত প্রায়শ্চিত্ত নাই। রাত কেটে যেতেই সে কেঁদে পড়ল হরিদাস ঠাকুরের পায়ে।

হরিদাস বললেন—"যা ক'রেছ আর ক'রো না।"

—"আমার কি উপায় হবে? এখন আমি কি করব? আমি পাপী, কি ক'রে উদ্ধার পা'ব ঠাকুর?"

হরিদাস বললেন—"চিন্তা কি মা? তুমি সব ছেড়ে দিয়ে একমনে হরিনাম কর, মনের সমস্ত ময়লা ধুয়ে মুছে যাবে। বিষয়-সম্পত্তি দান ক'রে ফেল।"

স্ত্রীলোকটি ফিরে গিয়ে তার যা কিছু সম্পত্তি ছিল সবই বিলিয়ে দিল। তারপর একমনে দিনরাত হরিনামই করতে লাগল। তার এই পরিবর্ত্তন দেখে সকল লোকেরই তাক লেগে গেল, সুতরাং হরিদাসের প্রতি তাদের ভক্তি গেল আরও বেড়ে।

এবার হরিদাস বেনাপোল ত্যাগ করলেন এবং শান্তিপুরের কাছে ফুলিয়া গ্রামে এসে বাস করতে লাগলেন। তাঁর আকৃতি, প্রকৃতি ও সাধনায় সেখানকার ব্রাহ্মণরাও অত্যন্ত মুগ্ধ হ'লেন। অল্পদিনের মধ্যেই শান্তিপুর অঞ্চলে তিনি সকলেরই ভক্তির পাত্র হ'লেন, কাজেই দলে দলে লোক তাঁর কাছে যাতায়াত আরম্ভ করলে।

এমন সময়েই এক মারাত্মক ব্যাপার ঘটল। হরিদাস মুসলমান, অথচ অনবরত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করেন। এই খবরটা অনেকেই প্রধান কাজী সাহেবের কাছে নিয়ে গেল, এবং যাতে কাজী সাহেব তাঁকে কঠোর শাস্তি দেন এমন বহু উপদেশও দিল।

হরিদাস বন্দী হ'লেন। অনেক লোকজন নিয়ে কাজী সাহেব বসলেন বিচার করতে। তিনি হরিদাসকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—"তুমি মুসলমান হ'য়েও হরিনাম কচ্ছ, মুসলমান ধর্ম্মের মতে এ একটা গুরুতর অপরাধ। তুমি হরিনাম ছাড়।"

হরিদাস নির্ভীক ভাবেই উত্তর দিলেন,—"আমি হরিনাম ছাড়তে পারব না।"

—"যদি তোমার প্রাণদণ্ড হয়?"

হরিদাস বললেন—"যদি আমার দেহ খণ্ড খণ্ড ক'রে আমাকে বধ করা হয়, তবু আমি হরিনাম ছাড়ব না। সব ধর্ম্মই এক, ভগবান এক, হিন্দু আর মুসলমান এক।"

প্রধান কাজীর মন গেল নরম হ'য়ে। তিনি বললেন—"তাই ত মরণকে যে ভয় করে না, তার আর কি করা যায়?"

অমনি গরাই নামে এক কাজী ব'লে উঠলেন,—"কিছু করা যাবে না কেন হুজুর? এর দৃষ্টান্তে মুসলমান সমাজের অনিষ্ট হ'তে পারে, সুতরাং শাস্তি দেয়াই উচিত, হুজুর। ওকে বেত মারা হোক বাইশ বাইশটি বাজারের মাঝখানে। লোকে দেখুক। যদি এত বেত খেয়েও বেঁচে থাকে, তবে বুঝব ও মহাপুরুষ, আর না বেঁচে থাকে তবে বুঝব ভণ্ডামি।"

প্রধান কাজী বেত মারবার হুকুমই দিলেন।

জল্লাদরা হরিদাসকে এক এক বাজারে নিয়ে যায় আর বেত মারে। যারা দেখে শিউরে ওঠে, চোখ বোজে, কেউ বা কেঁদে ফেলে, জল্লাদদের অভিশাপ দেয়। এমনি দৃশ্য এক এক বাজারে পর পর হ'তে লাগল।

তখন হরিদাসের মন কোথায়? ভগবানের ধ্যানে তিনি এমনি আত্মস্থ হ'য়ে আছেন যে, কিছুই টের পাচ্ছেন না, দেহের ওপরের এই নির্ম্মম অত্যাচারেও তিনি নির্ব্বিকার নিস্পন্দ।

জল্লাদরা বিস্মিত হ'ল। দু'তিন বাজারে বেত মারলেই ত

[illegible] ম'রে যায়, আর বাইশ বাজারে বেত মেরে মেরে হাত অবশ হ'য়ে গেল, তবুও কিছু হ'ল না।

হরিদাসের দেহ নিস্পন্দ, মনে হ'ল শ্বাস আর বইছে না। তবে ত বুঝি ম'রেছে, এই মনে ক'রে জল্লাদরা তাঁকে নিয়ে এল কাজী-সাহেবের কাছে।

কাজী বললেন—"গঙ্গায় ভাসিয়ে দাও। এত বেত খেয়ে কি বাঁচতে পারে ?"

হরিদাসের দেহ গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়া হ'ল। মুহূর্ত্ত মধ্যে স্রোতে সে দেহ যে কোথায় গেল তার খবর আর কেউ নিলে না।

এদিকে হ'ল কি! খানিকক্ষণ পরেই হরিদাস চেতনা লাভ ক'রে তীরে উঠে এলেন। মুখে অনবরত হরিনাম। কাজী সাহেব থেকে আরম্ভ ক'রে সকল লোকেরই তাক লেগে গেল। কাজী সাহেব এবার তাঁকে যা খুসী করবার আদেশ দিলেন।

এদিকে নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিতের ভক্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল। তাঁর অসাধারণ ভক্তি ও শক্তির কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। হরিদাস তাই এবার নিমাইয়ের সাক্ষাৎ লাভের জন্য এলেন নবদ্বীপে। নিমাইয়ের ভক্তগণ তাঁকে নিয়ে গেলেন নিমাইয়ের কাছে।

তাঁর মত মহাপুরুষের দর্শন পেয়ে শুধু নিমাইই নয়, অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণও আনন্দে আত্মহারা হ'লেন। সকলেই তাঁকে নিয়ে কোলাকুলি করলেন। হরিদাস নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন।

ব্রাহ্মণের ভণ্ডামি

গাঁয়ের লোক ভেঙে প'ড়েছে। রাস্তার পাশে বাড়ী। গৃহস্থ ব্যতিব্যস্ত। তার বাড়ীর আনাচে কানাচে লোক দাঁড়িয়ে অবাক্ হ'য়ে ম্যাজিক দেখছে।

ম্যাজিক যে দেখাচ্ছে তার নাম ডঙ্ক। ডঙ্কর নামেই দলে দলে লোক এসে জ'মত, কারণ তার মত অদ্ভুত ম্যাজিক দেখাতে আর কেউ পারত না। শুধু ম্যাজিক দেখিয়েই লোককে সে স্তম্ভিত ক'রে দিত না, গান গেয়েও সকলকে মুগ্ধ করত। তার বোলচালও বড় ভাল লাগত সকলের।

একটার পর একটা খেলা চলছে। এক একটা খেলা শেষ হচ্ছে আর সকলে হাততালি দিয়ে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে।

খানিকক্ষণ ম্যাজিক দেখিয়ে ডঙ্ক ধরলে এক গান। কী চমৎকার গলা। শ্রীকৃষ্ণ যে কালীয়দমন ক'রেছিলেন তারই কথা এই গানে ছিল। সকলে চুপ ক'রে মুগ্ধ হ'য়ে শুনছে।

হরিদাসও ঠিক এই সময়েই সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। গান শুনে তিনি ত আত্মহারা হ'য়ে নাচতে সুরু করলেন; নাচতে নাচতে প'ড়ে গেলেন অজ্ঞান হ'য়ে। সকলে ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরলে। কেউ বা হাওয়া করলে, কেউ বা মাথায় মুখে চোখে জল দিলে, কেউ বা হাত পা টিপে দিলে। তারপর খুব ভক্তির সহিত তাঁর পায়ের ধুলো নিলে। তিনিও আবার হরিনাম করতে করতে চ'লে গেলেন।

ডঙ্ক হাতে একটা বেত নিয়ে আবার ম্যাজিক দেখাতে লাগল। একটু পরেই একটা গান ধরল। এবার এক ব্রাহ্মণ আনন্দে অধীর হ'য়ে নাচতে লাগল। নাচতে নাচতে ধপাস ক'রে প'ড়ে গেল মাটিতে।

এবার সকলের আগে ছুটে এল ডঙ্ক। সে কিন্তু ব্রাহ্মণকে না ধ'রে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। একটু কাল পরেই তার হাতের বেত দিয়ে সপাৎ সপাৎ ক'রে খুব জোরে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলে ব্রাহ্মণের পিঠে। ব্রাহ্মণও একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে সটান লম্বা দিল।

সকলে ডঙ্ককে ঘিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে—"কি হ'ল? ব্রাহ্মণকে অমনি ক'রে বেত মারলে কেন বল ত?"

ডঙ্ক উত্তর দিল—"এ আর বুঝতে পাচ্ছেন না! এ ত সোজা কথা। এ বামুনটা ভয়ানক ভণ্ড। হরিদাস ভগবানের নামকীর্ত্তন শুনে ভাবে বিভোর হ'লেন, অচেতন হ'য়ে প'ড়ে গেলেন। আপনারা সকলে গিয়ে তাঁর সেবা করলেন, পায়ের ধুলো নিলেন। এই বামুনটার মনে আছে ঈর্ষ্যা, ভাবলে নাচতে নাচতে অচেতন হ'য়ে পড়লে সকলে ওরও পায়ের ধূলো নেবে, ওকেও একটা মহাপুরুষ মনে করবে। বাবা, ও সব চালাকি কি আমার কাছে চলে? আমি ভেল্কী দেখিয়ে বেড়াই, মুখ দেখে ব'লে দিতে পারি কার মনে কি আছে। এখানে এসেছে চালাকি মারতে। দু ঘা পিঠে পড়তেই প্রাণ বাঁচাতে পালাতে পথ পেলে না।"

জগাই মাধাই

একদিন নিত্যানন্দ বললেন—"আর আমি সইতে পারি না হরিদাস।"

হরিদাস বললেন—"তোমার অসহ্য হ'ল কিসে?"

নিত্যানন্দ। "জগাই আর মাধাই ভাই দুটো একেবারে উচ্ছন্ন গেছে। মদ খেয়ে পাঁড় মাতাল হ'য়ে যা তা করে। লোকের ওপর যে কি অত্যাচার করে তা ভাবলেই আমার বুক ফেটে যায়। বল ত ভাই, এমন ব্যবহার সইতে পারা যায় কি?"

হরিদাস। "না স'য়ে আর কি করবে? কী করতে পার তুমি?"

নিত্যানন্দ। "তাদের সৎপথে আনবার চেষ্টা করতে পারি। এস আমরা দু'জনেই তাদের কাছে গিয়ে হরিনাম শোনাই। পাপীরা যদি উদ্ধার হ'য়ে যায় তার চেয়ে আর বড় কাজ কী আছে? এস, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য করি। আমাদের কথা তা'রা না-ই শোনে যদি, কী আর করব?"

জগাই আর মাধাই দু'ভাই নদীয়ার সহর-কোটাল। তা'রা যদিও ব্রাহ্মণ কিন্তু পাপকার্য্য ছাড়া সৎকাজ করা, সত্যি কথা কওয়া, পরের উপকার করা তাদের স্বভাবের বাইরে। তাদের অধীনে ছিল বহু সেপাই, সেই জোরে এবং কাজীকে বশ ক'রে লোকের ওপরে অকথ্য অত্যাচার করত। লোকের বাড়ী-ঘর লুট করা, পুড়িয়ে দেয়া এবং সময় ও অবস্থা বিশেষে মানুষ খুন করা তাদের প্রায় রোজকার ব্যাপার ছিল। মদে ত প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই চুর হ'য়ে থাকত।

নিত্যানন্দ আর হরিদাস ত পরামর্শ ক'রে একদিন গিয়ে উপস্থিত হ'লেন জগাই আর মাধাইয়ের কাছে। জগাই মাধাই তখন পাঁড় মাতাল। চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল।

এগিয়ে গিয়েই নিত্যানন্দ তাদের বললেন—"তোমাদের কাছে আমাদের এই ভিক্ষা যে তোমরা পাপ কাজ ছাড়, সৎপথে এস, হরিনাম কর।"

এক সঙ্গে দু'ভাই মুখ বেঁকিয়ে ব'লে উঠল—"ভারি সাধুপুরুষ এসেছেন ত আমাদের উপদেশ দিতে। ওসব বুজরুকি আমাদের এখানে চলবে না বুঝলে? আস্তে আস্তে খ'সে পড় বাপু।"

নিত্যানন্দ আর হরিদাস আবার বললেন—"হরিনাম কর ভাই, হরিনাম কর।"

এবার ক্রোধে গর্জ্জন ক'রে জগাই মাধাই বললে—"বটে! তোদের বুঝি প্রাণের মায়া নেই, য়্যাঁ? আস্পর্দ্ধা ত কম নয় রে।"

নিত্যানন্দ ও হরিদাস আবার বললেন—"কৃষ্ণ ভজ; ভাই, কৃষ্ণ ভজ।"

"আবার? ধর ত ভণ্ড বেটাদের, জন্মের মত উপদেশ দেয়াচ্ছি," ব'লেই গর্জ্জন ক'রে জগাই তেড়ে এল।

এদিকে নিত্যানন্দ ও হরিদাসও বেগতিক দেখে মারলেন ছুট। জগাই মাধাই দৌড়তে গিয়ে পা ট'লে প'ড়ে গেল।

হরিদাস বললেন নিত্যানন্দকে—"কেমন ভাই শিক্ষা হ'ল ত? আর যাবে পাপীকে উদ্ধার করতে?"

নিত্যানন্দ বললেন—"তা যা-ই বল ভাই, তোমার বুদ্ধিতেই এ রকমটা হ'ল। তুমি পরামর্শ দিয়েই ত আমাকে আনলে, আর এমনি করে অপদস্থ করালে।"

হরিদাস বললেন—"খুব বললে যা হোক্। তোমারই বুক বাজছিল ফেটে, তুমিই টিকতে পারলে না। এখন দোষ হ'ল আমার।"

নিত্যানন্দ বললেন—"আবারও কিন্তু আসিতে হবে, সহজে কি ছেড়ে দেবো মনে ক'রেছ ?"

দু'জনেই গেলেন নিমাইয়ের কাছে। নিত্যানন্দ নিমাইকে বললেন—"দেখ ঠাকুর, সৎলোককে সৎপথে আনতে সকলেই পারে, কিন্তু অসৎকে যিনি সৎপথে আনতে পারেন, পাপীকে যিনি ধার্ম্মিক করতে পারেন তাঁরই বাহাদুরী। তুমি ত অনেককেই তোমার ভক্ত ক'রেছ, হরিনামে পাগল ক'রে দিয়েছ, কিন্তু জগাই-মাধাইকে সাধু কর ত দেখি, একবার হরিনাম লওয়াও দেখি। ওদের মত পাপীকে পুণ্যাত্মা ক'রে তুলে দাও, দেখি তোমার শক্তি আর দয়ার পরিচয়। এ কাজ তুমিই পার।"

নিমাই হাসতে হাসতে বললেন—"তোমার যখন এত আগ্রহ জগাই মাধাই উদ্ধার না হ'য়ে যায় কোথা ?"

জগাই মাধাই সহরের কোটাল, কাজেই সময়ে সময়ে সহরের এক পাড়ায় এসে তাঁবু ফেলেও থাকত। তা'রা এলেই পাড়ার লোক ভয়ে জড়সড়। কি জানি কখন কি করে।

এবার জগাই মাধাই এসে তাঁবু ফেললে নিমাই পণ্ডিতের পাড়ায়।

সন্ধ্যা হ'য়েছে। তা'রাও হরদম মদ খাচ্ছে। এদিকে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে কীর্ত্তন হচ্ছে। বেশী রাত্রে কীর্ত্তনের সুর তাদের কানে গেল। তা'রা গান শোনবার জন্য টলতে টলতে গেল শ্রীবাসের বাড়ীতে। দরজা বন্ধ, ভেতরে ঢুকতে পারলে না, কাজেই [illegible] দাঁড়িয়ে গান শুনতে লাগল। পা টলছে, মাথার ভেতরে ঘোর [illegible] কচ্ছে, কান ভোঁ ভোঁ কচ্ছে, চোখে সবই ঘোলাটে দেখাচ্ছে। [illegible]

কথা তা'রা বুঝতে পাচ্ছে না, শুধু সুরই কানে ঢুকছে। মাঝে মাঝে তাদের নাচ পাচ্ছে।

এমনি ক'রে রাত কেটে গেল। ভোর হ'তে না-হ'তেই কীর্ত্তন থামল। ভক্তগণ গঙ্গাস্নান করবার জন্য দরজা খুলে বেরিয়েই একেবারে পাথর হ'য়ে গেলেন—সামনেই জগাই মাধাই! নিমাই একপাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখেই জগাই মাধাই বললে—"ওহে নিমাই পণ্ডিত, তোমাদের এখানে কি মঙ্গলচণ্ডীর গান হচ্ছিল? ভারি খুসী হ'য়েছি তোমাদের গান শুনে। আমাদের বাড়ীতে গিয়ে একদিন তোমাদের গান গাইতেই হবে।"

কেউ কোন উত্তর না দিয়ে সেখান থেকে মারলেন দৌড়—সোজা গঙ্গার ঘাটের দিকে।

বিকেলবেলা নিত্যানন্দ অনেক ভক্ত নিয়ে উপস্থিত হ'লেন নিমাইয়ের কাছে; বললেন—"জগাই মাধাইয়ের একটা বিহিত কর প্রভু।"

নিমাই বললেন—"তোমাদের সকলেরই যখন একান্ত ইচ্ছা তখন জগাই মাধাই তরবে দেখছি। আচ্ছা, এক কাজ কর। ভক্তদের ডেকে আন, সকলে একত্রে কীর্ত্তন করতে করতে তাদের কাছে যা'ব, তাদের হরিনাম দেবো, এ নামের যে কত শক্তি তা দেখা'ব।"

এতদিন বাইরে কোথাও কীর্ত্তন হয় নি, হ'য়েছে বাড়ীর ভিতরে, তাতে বাইরের কোন লোককে প্রবেশ করতে দেয়া হয় নি; কাজেই ভক্তগণ ভিন্ন আর কেউ কীর্ত্তন দেখতে পায় নি। এই তাঁদের প্রথম নগর কীর্ত্তন। কেউ নিলেন খোল, কেউ নিলেন করতাল, কেউ

নিলেন শঙ্খ। নিমাইয়ের বাড়ী থেকে সকলে গান গাইতে গাইতে বেরুলেন। সামনে নিত্যানন্দ, তাঁর পেছনে আর সকলে।

কীর্ত্তনের শব্দে জগাই মাধাইয়ের ঘুম ভেঙে গেল। সারারাত জেগে তা'রা মদ খেয়ে হল্লা ক'রেছে, ঘুমিয়েছে দিনে। বিকেল হ'য়েছে—তবু অচেতন। ঘুম ভেঙে যেতেই অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে প্রহরীকে ডেকে তা'রা বললে—"যা ত ছুটে, গোলমাল করতে বারণ কর। একটু সুস্থ হ'য়ে ঘুমা'ব তারও জো নেই।"

প্রহরী ছুটে গিয়ে বারণ করলে। কিন্তু কার কথা কে শোনে? ভক্তরা তখন আরও জোরে কীর্ত্তন কচ্ছেন। তাঁরা যতই জগাই মাধাইয়ের বাড়ীর কাছে আসতে লাগলেন তাঁদের কীর্ত্তনের জোরও ততই বাড়তে লাগল।

প্রহরী গিয়ে ভয়ে ভয়ে বললে—"হুজুর, নিমাই পণ্ডিত তাঁর দলবল নিয়ে কীর্ত্তন করতে করতে আসছেন। বারণ করলুম, কিন্তু কেউই আমার কথায় কান দিলেন না।"

হুঙ্কার দিয়ে উঠে জগাই মাধাই বললে—"বটে! এত বড় আস্পর্দ্ধা ভণ্ড বেটাদের! আমাদের কথাটা একেবারে গ্রাহ্যই করলে না। আচ্ছা দেখাচ্ছি এবার।"

রাগের চোটে দু'ভাইয়ের চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছে। চলল তা'রা কীর্ত্তন বন্ধ করতে।

তাদের দেখে ভক্তরা ভয় ত পেলেনই না, বরং আরও জোরে, আরও উৎসাহের সহিত নেচে নেচে কীর্ত্তন গাইতে লাগলেন। রাগে তা'রা জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়ল।

নিত্যানন্দ ছিলেন সকলের সামনে। জগাই মাধাই যেতেই অতি

করুণভাবে তিনি তাদের দিকে চেয়ে রইলেন আর তাঁর দু'চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়তে লাগল। সে দৃশ্যে পাষাণও গলে, কিন্তু জগাই মাধাইয়ের প্রাণ ত গললই না, তাদের রাগ আরও বেড়ে গেল। এদিকে কীর্ত্তনও খুব জোরে চলতে লাগল। নিত্যানন্দ কাঁদতে কাঁদতে বললেন—"একবার হরি বল ভাই, একবারটি বল।"

প্রেমে আত্মভোলা নিত্যানন্দের করুণ দৃষ্টি, চোখের জল, কীর্ত্তনে উন্মত্ত ভক্তগণের নৃত্য দেখে জগাইয়ের মনটা কেমন ক'রে উঠল। নিত্যানন্দ আবার 'হরি বল' বলতেই জগাইও ব'লে ফেললে, 'হরি বল'।

মাধাই অমনি গর্জ্জন ক'রে ব'লে উঠল—"খবর্দ্দার জগাই। ফের বলবি ত ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি। এই নিতাই বেটাই পাজী ভণ্ড, হরিনাম নেয়াতে এসেছে, দেখাচ্ছি তোমাকে।"

রাস্তার পাশে একটা কলসীর কানা প'ড়েছিল, তাড়াতাড়ি আর কিছু না পেয়ে, মাধাই সেই কলসীর কানাটা জোরে ছুঁড়ে মারলে নিত্যানন্দের মাথায়। মাথায় বিষম আঘাত লাগল, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। নিত্যানন্দ আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

রক্তপাত দেখেও মাধাইয়ের মন নরম হ'ল না। সে আবার নিত্যানন্দকে মারবার জন্য যেমনি হাত তুলেছে জগাই অমনি তার হাত ধ'রে বললে,—"ছি মাধাই, কী কচ্ছিস? এমন নিরীহ বিদেশী সন্ন্যাসীকে মেরে কী বীরত্ব দেখাচ্ছিস? তোর কি এতে ভাল হবে?"

মাধাই বাধা পেয়ে বললে—"জগা, তোরও মাথা বিগড়েছে রে বেটা।"

নিত্যানন্দ তখনও আনন্দে নাচছেন আর বলছেন—"কলসীর কানা মেরেছিস, দুঃখ নেই ভাই, একবার মধুর হরিনাম বল।"

জগাই হরিনাম বলতে লাগল। তারও চোখের জল কোন বাধা মানলে না। নিত্যানন্দের মাথা থেকে রক্ত ছুটতে দেখে নিজেদের সারা জীবনের পাপ কার্য্যের জন্য তার অনুতাপ হ'ল। ভক্তগণের সঙ্গে সেও উচ্চৈঃস্বরে 'হরিবল' 'হরিবল' বলতে বলতে নাচতে আরম্ভ করলে।

তার কাণ্ড দেখে মাধাই হতভম্ভ। তার মদের নেশা ছুটে গেছে। মার খেয়েও যিনি বলতে পারেন

"মেরেছিস্ মেরেছিস্ তাহে ক্ষতি নাই,
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই॥"

তিনি ত মানুষ নন—তিনিই দেবতা। এমন দেবতাকে আঘাত দেয়ার জন্য তার ভারি দুঃখ হ'ল, মহাপাপের কথা ভেবে অবসন্ন হ'য়ে পড়ল। নিত্যানন্দের সঙ্গে সঙ্গে সেও এবার বললে, 'হরিবল'।

নিত্যানন্দ দু'ভাইয়ের সঙ্গে বার বার কোলাকুলি করলেন। তারা কেঁদে নিত্যানন্দের পা জড়িয়ে ক্ষমা চাইলে।

নিত্যানন্দ বললেন—"তোমরা নিমাইয়ের কাছে ক্ষমা চাও। তিনি ক্ষমা করলেই তোমরা উদ্ধার হবে, তাঁরই দয়া ভিক্ষা কর।"

জগাই মাধাই তখন নিমাইয়ের কাছে কেঁদে প'ড়ে বললে—"প্রভু, মহাপাপী আমরা। এমন কোনও পাপ কাজ নেই যা আমরা করি নি। একদিনও ত ভাবি নি কি গতি হবে। এখন উপায় কি আমাদের তোমার চরণে স্থান দাও প্রভু।"

নিমাই বললেন—"তোমরা নিত্যানন্দের কাছে ক্ষমা চাও। মাধাই তাঁরই অঙ্গে রক্তপাত ক'রেছে। মাথা থেকে তীরের মত রক্ত ছুটছে, এ অবস্থায়ও যিনি তোমাদের প্রেম দেয়ার জন্য ব্যাকুল তাঁর চরণে শরণ লও।"

দু'ভাই তখন আবার নিত্যানন্দের পায়ে পড়ল। চোখ থেকে জল পড়ছে, শরীর ধূলোয় মাখামাখি হ'য়ে গেছে, ভক্তরা তাদের ঘিরে কেবল কীর্ত্তন কচ্ছেন। সেই "হরিবল" "হরিবল" রোলের মধ্যে দু'ভাই ধূলোয় নিস্পন্দ হ'য়ে প'ড়ে আছে।

বহু লোক জমেছে। সকলেই অবাক্ হ'য়ে দেখছে আর ভাবছে, যাদের নামে সকল লোক আঁৎকে ওঠে, দেখলে পালাবার পথ পায় না, যাদের মুখের দিকে চেয়ে কথা কইতে পারে এমন লোক দেখা যায় না, সেই জগাই মাধাই আজ ধূলোয় লুটোচ্ছে, চোখের জলে নিমাই পণ্ডিত আর নিত্যানন্দের কৃপা ভিক্ষা কচ্ছে। এ হ'ল কি! ভক্তের কি মহিমা! সোনার কাঠি ছুঁয়ে রূপকথার রাজকন্যার বেঁচে ওঠবার মত মহাপাপী জগাই মাধাই ভক্তের স্পর্শ পেয়ে মানুষ হ'য়ে গেল।

নিত্যানন্দ তাদের ক্ষমা করলেন। ভক্তের গৌরব বাড়াবার জন্য নিমাই তাদের বলেছিলেন নিত্যানন্দের কাছে ক্ষমা চাইতে।

জগাই মাধাইয়ের পুনর্জ্জন্ম হ'ল।

নিমাই আর সেখানে রইলেন না, সঙ্গীদের নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন।

সন্ধ্যা হ'য়েছে। নিমাইয়ের বাড়ীর দরজায় কে ডাকছে—"ঠাকুর, ঠাকুর।"

কয়েকজন ভক্ত গিয়ে দরজা খুলেই দেখলেন জগাই মাধাই দাঁড়িয়ে।

নিমাই তাদের নিয়ে আসতে বললেন। তা'রা ঢুকেই উপুড় হ'য়ে পড়ল। নিমাই নিত্যানন্দকে বললেন—"শ্রীপাদ, এ দুটিকে তুমি নিয়ে যাও, গঙ্গাস্নান করিয়ে এদের কানে হরিনাম দাও।"

জগাই মাধাই অচেতন হ'য়ে প'ড়ে আছে। ভক্তগণ কীর্ত্তন করতে করতে তাদের নিয়ে চলল গঙ্গার তীরে।

এদিকে সারা নদীয়ায় তাদের এই ব্যাপার নিয়ে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'য়েছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাদের এ কী বিরাট পরিবর্ত্তন হ'য়েছে! যাদের রাজার মত প্রতাপ তা'রা ধূলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে!

খবর পেয়ে দেখতে না-দেখতেই হাজার হাজার লোক ছুটে এল, গঙ্গার তীরে লোকে গিস্ গিস্ করতে লাগল। চাঁদের রূপালি আলোতে সকলেই সুস্পষ্ট সব দেখতে পেলে। জগাই মাধাইকে গঙ্গায় স্নান করানো হ'ল। দু'ভাইকে দু'পাশে নিয়ে মাঝখানে নিমাই। নিত্যানন্দ তাদের কানে হরিনাম দিলেন।

গঙ্গার তীর থেকে ভক্তগণ আবার কীর্ত্তন করতে করতে ফিরে এলেন। তাঁদের সঙ্গে জগাই মাধাইও সজল চোখে হরিনামে মত্ত হ'য়ে নাচতে লাগল। আর তা'রা ঘরে ফিরে গেল না, আহার-নিদ্রাও প্রায় ত্যাগ করলে। সেই থেকে তা'রা জগতের সব জিনিষের মায়া কাটিয়ে দিনরাত হরিনাম জপ করত, আর নিতান্ত দরিদ্র ভিখারীর মত ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিধান ক'রে গঙ্গার তীরে ব'সে থাকত। কেউ ঘাটে এলে তার পা ধ'রে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাইত।

"এমনি হরির অহেতু করুণা প্রেমের এমনি যাদু,
কয়লাহৃদয় গলি' হীরা হয়, তস্করও হয় সাধু।"

মাধাই গঙ্গাতীরে নিজের হাতে একটি ঘাট তৈরি ক'রেছিল। নবদ্বীপে এখনও সেই ঘাটটিকে লোকে 'মাধাইয়ের ঘাট' বলে।

চাপাল গোপাল

চাপাল গোপালের ভারি তেজ। একে ব্রাহ্মণ তায় আবার মহা-পণ্ডিত। টোল আছে, ছাত্র পড়ান। দাপট এত বেশী যে, অনেকেই তাঁকে বেশ ভয় ক'রে চলে। খুব জোরের ওপরেই তিনি দিন কাটান।

নদীয়ায় কীর্ত্তনের ঢেউ উঠেছে, সে ঢেউ প্রবলবেগে ছুটে চ'লেছে বাংলার দিকে দিকে। নদীয়া টলমল, সারা বাংলাও চঞ্চল।

চাপাল গোপালের ভারি রাগ এই কীর্ত্তনের ওপর। তিনি লোকদের বলতেন—"এ আবার কি ঢং বাবা। এত কাল ত এই সব ছিল না, লোকে কি ধর্ম্মকর্ম্ম করে নি? শাস্ত্র নেই ধর্ম্ম নেই—ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মুসলমান একত্রে হরিনাম ক'রে ক'রে ধেই ধেই নৃত্য। মন্ত্র নেই, তন্ত্র নেই—সব জাত মিলে খালি হরিনাম কর আর নাচ। হুজুগ পেলেই মানুষ ক্ষেপে ওঠে, কিন্তু মজা এই দেশের বড় বড় পণ্ডিতগুলোও শেষে ক্ষেপে গেল! নিমাই পণ্ডিত বেশ মজার খেলাই সুরু ক'রেছে। আমিও চাপাল গোপাল, ভাল ক'রে দেখে নেব'খন।"

শ্রীবাসের বাড়ীতে কীর্ত্তন হয়। চাপাল গোপালের ইচ্ছা হয় যে তাঁকে চিবিয়ে খান।

একদিন গভীর রাত্রে কীর্ত্তনে যখন সব তন্ময়, ঠিক সেই সময়ে শ্রীবাসের বাটীর বাইরে চাপাল গোপাল গোপনে গোপনে এক পূজার

আয়োজন করলেন। কীর্ত্তনের সময় দরজা একেবারেই খোলা হ'ত না, কাজেই কেউ আর কিছুই টের পেলে না।

ভোর হ'তেই দরজা খুলে শ্রীবাস বেরিয়েই দেখতে পেলেন এক পাত্র মদ প'ড়ে আছে, রাত্রে সেখানে ব'সে মদ খাওয়া হ'য়েছে, পাঁঠা-বলির রক্ত র'য়েছে। মনে ভারি ব্যথা পেলেন। কি আর করেন? পাড়ার লোকজন ডেকে এনে তিনি দেখালেন; বুঝলেন যে, চাপাল গোপাল ছাড়া এমন অপকর্ম্ম আর কেউ করে নি।

দিন দুই পরে চাপাল গোপাল টোলের ছাত্রদের পড়াচ্ছেন। তাঁর আঙ্গুল ফুলেছে দেখে একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করলেন—"আপনার আঙ্গুলে ও কি হ'য়েছে?"

চাপাল উত্তর দিলেন—"তোমরা যা ভাবছ, এ তা নয়।"

ছাত্রটি বললেন—"আমরা ত কিছুই ভাবি নি, শুধু কারণটি জিজ্ঞেস কচ্ছি।"

চাপাল বললেন—"তোমরা ভেবেছ আমার কুষ্ঠরোগ হ'য়েছে। তা হয় নি। শাস্ত্র প'ড়েছি, শিবপূজা করি, আমার হবে ব্যারাম?"

শাস্ত্র পাঠ আর শিবপূজা তাঁর ব্যারাম কিন্তু ভাল ক'রে দিলে না। দিন দিন তাঁর রোগ বৃদ্ধি হ'তে লাগল।

তাঁর অবস্থা দেখে একজন দয়ালু লোক তাঁকে বললেন—"আপনি একবার নিমাই পণ্ডিতের শরণ নিন, তিনি আপনার ব্যারাম ভাল করতে পারেন।"

একদিন চাপাল নিজের ব্যারামের চিন্তায় নিতান্ত বিষণ্ণ হ'য়ে ব'সে আছেন। সেই সময়ে নিমাই গঙ্গাস্নান করতে এসেছেন। চাপাল তাঁকে বললেন—"নিমাই পণ্ডিত, শুনছি তুমি নাকি খুব বড় সাধু হ'য়েছ।

লোকের ব্যারাম অনায়াসেই ভাল করতে পার। আমার ত এই ব্যারাম হ'য়েছে, দয়া ক'রে ভাল ক'রে দাও না। আমরা ত এক গাঁয়েই বাস করি।"

নিমাই বললেন—"ঠাকুর, একথা ব'লে আমায় অপরাধী কর কেন?"

নিমাই চ'লে গেলেন। চাপাল গোপাল অতি কষ্টে গেলেন কাশীতে। সেখানে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে ধর্ণা দিলেন। বিশ্বেশ্বর কতকটা প্রীত হ'লেন, কারণ তিনি নিজে রোগ না সারিয়ে চাপালকে স্বপ্নে বললেন—"তুমি ফিরে যাও নবদ্বীপে, সেখানে নিমাইয়ের চরণে শরণ লও। সরল মনে, সরল প্রাণে তাঁর আশ্রয় নিলেই তুমি আরোগ্য লাভ করবে।"

চাপাল কাশী থেকে ফিরে এলেন। নিমাইয়ের সাক্ষাৎ তখন তিনি পেলেন না। রোগে গলিত দেহ নিয়ে তাঁকে পাঁচ পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হ'ল। পাঁচ বছর পর কুলিয়া গ্রামে তিনি নিমাইয়ের দর্শন পেলেন, অমনি তাঁর পায়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগলেন।

নিমাই বললেন—"ঠাকুর, তুমি শ্রীবাসের নিকট অপরাধী, তাঁর দয়া পেলেই তুমি রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাবে।"

চাপালের মনের সমস্ত ময়লা তখন ধুয়ে মুছে গেছে, কাজেই শ্রীবাসের দয়া তিনি পেলেন এবং দেহের রোগ ও মনের রোগ থেকেও মুক্তি লাভ করলেন।

সন্ন্যাসীর কাণ্ড

খুব ভোরে উঠে নিমাই আর নিত্যানন্দ চ'লেছেন শান্তিপুরের দিকে। সেখানে অদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ী যাবেন।

শান্তিপুর আর নবদ্বীপের মাঝামাঝি গঙ্গার তীরে ললিতপুর গ্রাম। যেতে যেতে গঙ্গার তীরে একটি বাড়ী দেখে নিমাই জিজ্ঞেস করলেন—"এ বাড়ী কার?"

নিত্যানন্দ উত্তর দিলেন—"এ বাড়ী একজন গৃহস্থ সন্ন্যাসীর।"

নিমাই বললেন—"আচ্ছা এসো ত, দেখা যাক গৃহস্থ সন্ন্যাসী কেমন?"

তাঁরা গেলেন সন্ন্যাসীর বাড়ীতে। সন্ন্যাসীকে দেখেই নিত্যানন্দ নমস্কার করলেন, সন্ন্যাসীও অমনি তাঁকে নমস্কার করলেন। নিমাইও প্রণাম করলেন, সন্ন্যাসী কিন্তু নিমাইকে নমস্কার না ক'রে আশীর্ব্বাদ করলেন,—"তোমার জ্ঞান হোক, ধন হোক, ভাল বিয়ে হোক, সুন্দর ছেলে হোক," ইত্যাদি।

নিমাই বললেন—"এ কি আশীর্ব্বাদ করলেন, না অভিশাপ দিলেন? এ আশীর্ব্বাদ হয়তো আমি নেব না। আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন 'কৃষ্ণদাস' হই।"

সন্ন্যাসী বড় দুঃখ বোধ করলেন, বললেন—"এতদিন শুনে এসেছি যে এক রকমের লোক আছে, তাদের ভাল কথা বললে লাঠি নিয়ে মাথা ভাঙতে আসে, আজ তা স্বচক্ষে দেখলুম। তোমাকে কিসে আমি আশীর্ব্বাদ না ক'রে অভিশাপ দিয়েছি? টাকা কে চায় না;

বাপু? বিদ্যাও সকলেই চায়, আর সুন্দরী স্ত্রী চায় না এমন লোক ত বড় একটা দেখাই যায় না। এর চেয়ে ভাল বস্তু জগতে আর কি আছে বল।"

নিমাই বললেন—"আপনি যে সুখের কথা বলছেন সে আর ক'দিনের? মানুষের জরা আছে, মৃত্যু আছে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়, যেন জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারি।"

সন্ন্যাসী একটু অসন্তুষ্ট হ'লেন, বললেন—"বাপু, তুমি এসেছ আজ আমায় শেখাতে? ভারতের কোন্ তীর্থে যাই নি? তীর্থভ্রমণ ক'রেই ত জীবনটা কাটিয়েছি। অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি। তুমি ত কালকের ছেলে, তুমিই এখন ধর্ম্ম শেখাতে এলে?"

সন্ন্যাসী যে একটু রেগেছেন তা নিত্যানন্দ বুঝতে পেরে বললেন—"বালকের কথায় আপনি চটছেন কেন? আপনার দর্শন লাভ ক'রেই আমি ত আপনার মহিমা বুঝতে পেরেছি।"

সন্ন্যাসী ঠাণ্ডা হ'লেন। তখন বেলা হ'য়েছে দেখে বললেন—"ভাগ্যক্রমে যখন দর্শন পেলুম তখন আজকে আর যেতে দেবো না। আজ এখানে সেবা করতে হবে।"

নিত্যানন্দ বললেন—"থাকতে পারলে আমরাও অত্যন্ত আনন্দিত হতুম, কিন্তু থাকবার যে জো নেই। আমরা একটা বিশেষ দরকারে বেরিয়েছি, এখনি যেতে হবে।"

সন্ন্যাসী বললেন—"তা কি হয়? অতিথি দেবতা।"

নিত্যানন্দ বললেন—"আমরা একটু জল খেয়ে যাই, তা হ'লে কোন দোষ হবে না।"

সন্ন্যাসীর স্ত্রী আম, কাঁঠাল ও দুধ এনে জলযোগের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। নিমাই আর নিত্যানন্দ জলযোগ করতে ব'সেছেন। সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন—"কিছু আনন্দ এনে দেবো কি ?"

কী সর্ব্বনাশ! নিত্যানন্দ মহাবিপদে পড়লেন। সন্ন্যাসীর স্ত্রী ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। অতিথিদের জলযোগে ব্যাঘাত হবে আশঙ্কা ক'রে তিনি সন্ন্যাসীকে ডেকে নিয়ে গেলেন বাড়ীর ভিতরে।

নিমাই নিত্যানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন—"আনন্দ কি ?"

নিত্যানন্দ বললেন—"আনন্দ মানে মদ।"

"তবে জলদি উঠে এস" ব'লেই নিমাই বেরিয়ে এলেন, পেছনে নিত্যানন্দ। সন্ন্যাসী টের পেয়ে পাছে তাঁদের ধরবার চেষ্টা করেন এই আশঙ্কায় তাঁরা গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন।

দু'জনেই খুব ভাল সাঁতারু, স্রোতও অনুকূল। আর ডাঙায় না উঠে তাঁরা ভেসে চললেন শান্তিপুরের দিকে। প্রায় দু'ক্রোশ সাঁতার কেটে ভিজে কাপড়ে তাঁরা এসে উপস্থিত হ'লেন অদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ীতে।

অদ্ভুত শিষ্যলাভ

সারঙ্গদেব খুব বড় সন্ন্যাসী। শ্রীগোপীনাথ ঠাকুরের সেবা করেন, জগতে তাঁর এই গোপীনাথ ছাড়া আর কেউ নেই। ভারি বুড়ো হ'য়ে প'ড়েছেন। নদীয়ার একপাশে নিরিবিলি থাকেন।

নিমাইয়ের বড় ভক্ত ব'লে এক দিন নিমাই তাঁকে বললেন—"সারঙ্গদেব, তুমি বড় বুড়ো হ'য়ে প'ড়েছ, এক জন শিষ্য না হ'লে এর পরে গোপীনাথের সেবা চলবে কি ক'রে? তুমি একজন শিষ্য নাও।"

সারঙ্গ বললেন—"ঠাকুর, গুরু ঢের মিলে, কিন্তু শিষ্য মেলে ক' জন? যাকে তাকে ত আর শিষ্য করা যায় না।"

নিমাই বললেন—"সে কথা যাক, শিষ্য একটি তোমার করতেই হবে। দেরী করলে চলবে না।"

সারঙ্গ বললেন—"ঠাকুর, তোমার যখন এত ইচ্ছা, তখন আর কথা কি? বাছাই ক'রে নেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। এক কাজ করা যাক। কাল ভোরে প্রথমে যার মুখ দেখব তাকেই শিষ্য করব।"

নিমাই বললেন—"বেশ, তা-ই কর।"

পরদিন ভোরে উঠেই সারঙ্গদেব গঙ্গায় ডুব দিয়ে অল্প জলে ব'সে চোখ বুজে মালা জপ কচ্ছেন।

সূর্য্যের সোনালি আলো সবে এসে পৃথিবীর গায়ে ঠেকেছে। এমন সময়ে সারঙ্গ অনুভব করলেন কি যেন একটা বস্তু তাঁর কোলে এসে লেগেছে। চোখ খুলেই দেখলেন এক মরা ছেলে, দশ-এগারো বছর বয়স, ভারি সুন্দর চেহারা, মাথা কামানো, গলায় পৈতা, চোখ দুটি আধেক খোলা—মনে হয় যেন ঘুমুচ্ছে। দেহে তখনও প্রাণ

আছে ব'লে মনে হ'ল। ঠাকুরের এ কী খেলা, কোথা থেকে এই মরা ছেলে আমার কোলে এনে দিলেন, সারঙ্গ এই সব ভাবছেন।

তখনই তাঁর মনে পড়ল তিনি প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, ভোরে প্রথমে যার মুখ দেখবেন তাকেই শিষ্য করবেন। মরা ছেলেকে শিষ্য করেনই বা কি ক'রে? আবার ভাবলেন, প্রতিজ্ঞা পালন করতেই হবে। ছেলেটি মরাই হোক আর জ্যান্তই হোক, তা আর দেখবার দরকার নেই। তিনি মরা ছেলের কানেই মন্ত্র দিলেন।

তখন বেলা হ'য়েছে। দলে দলে লোক গঙ্গাস্নান করতে এসেছে। তা'রাও চার দিকে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে সব দেখতে লাগল। একটু যত্ন ও শুশ্রূষার পরই বালকটি আস্তে আস্তে চোখ খুললে। সকল লোক খুব জোরে হরিনাম করলে। সকলেই স্তম্ভিত। ছেলেটিকে সারঙ্গদেব ধ'রে বসালেন। একটু পরেই কোলে ক'রে তাকে আনা হ'ল সারঙ্গের আশ্রমে।

এদিকে কীর্ত্তন শেষ ক'রে নিমাই ভক্তদের নিয়ে সারঙ্গের আশ্রমে এসে উপস্থিত। তিনি সারঙ্গকে জিজ্ঞেস করলেন—"শিষ্য পেয়েছ? বেছে নিতে পারবে না ব'লেছিলে, দেখছি ত বেশ বাছাই ক'রেছ।"

সারঙ্গ বললেন—"ঠাকুর, পুত্রস্নেহ কি জানতুম না, আজ কিন্তু এই শিশুকেই আমার পুত্র ব'লে মনে হচ্ছে।"

ছেলেটি তখন সুস্থ হ'য়েছে।

নিমাই তাকে জিজ্ঞেস করলেন—"বল ত বাবা তুমি কে? এখানেই বা কি ক'রে এলে?"

ছেলেটি বললে—"আমার নাম মুরারি। আমার বাবা ও মা বাড়ীতে

আছেন। আমাদের বাড়ী সরগ্রামে।* আমাদের গোস্বামা বলে। সম্প্রতি আমার পৈতা হ'য়েছে। রাত্তিরে আমাকে সাপে কামড়েছিল, আমি অজ্ঞান হ'য়ে যাই। বোধ হয় সকলেই আমাকে মরা ভেবে আমাদের গাঁয়ের পাশের খড়ী নদীতে ফেলে দেয়। খড়ী নদী দিয়ে ভাসতে ভাসতেই বোধ হয় গঙ্গায় এসে প'ড়েছি।"

মুরারির ছ'চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সেখানে উপস্থিত সকলের চোখেই জল এল।

সাপের কাপড়ে যার মৃত্যু হয়, তাকে পোড়াতে নেই, তাই মুরারিকে মরা ভেবে নদীতে ফেলে দেয়া হ'য়েছিল।

নিমাই তাকে জিজ্ঞেস করলেন—"তোমার মা-বাপ নিশ্চয়ই তোমার শোকে পাগল হ'য়েছেন, আর তোমার মনও তাঁদের জন্য কেমন কচ্ছে। এস, তোমাকে এখুনি তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেই।"

মুরারি বললে—"মা আর বাবা নিশ্চয়ই পাগল হ'য়েছেন, কিন্তু তাঁদের কাছে যাই কি ক'রে? যিনি আমার প্রাণরক্ষা ক'রেছেন এবং আমার কানে মন্ত্র দিয়েছেন সেই গুরুকে ছেড়ে ত যেতে পারব না।"

সকলেই বিস্মিত। সারঙ্গ কেঁদে ফেললেন।

মুরারির বাপ-মার কাছে খবর গেল। শুধু তার বাপ-মা নয়, তাদের গাঁয়ের অনেক লোক এল।

মুরারি আর ফিরে গেল না। সেই থেকে সন্ন্যাসী হ'য়ে গুরুর সেবায় রত হ'ল। তার বাপ-মা সারঙ্গদেবের শিষ্য হ'লেন। তারপর সকলে মিলে একদিন নিমাইয়ের বাড়ী গেলেন।

* সরগ্রাম বর্দ্ধমান জেলার গুসকরা ষ্টেশনের কাছে। সেই গোস্বামী বংশীয়েরা এখনও আছেন।

কাজীর বিচার

চাঁদ কাজী খুব ন্যায় বিচার করেন। বুদ্ধিতে, গুণে, মানে দেশের মধ্যে তাঁর সম্মান ও প্রতিপত্তি খুব বেশী। হিন্দু-মুসলমান দুই ভাইয়ের মত পরম স্নেহে পাশাপাশি বাস করে। তিনি যে সে ঘরের ছেলে নন, গৌড়ের নবাবের দৌহিত্র।

একদিন তাঁর কাছে নদীয়ার কয়েকজন হিন্দু গিয়ে নালিশ করলে—"হুজুর, নদীয়ায় ত বাস করা দায়। নিমাই পণ্ডিত এমনি কাণ্ড আরম্ভ ক'রেছেন যে, হিন্দুধর্ম্ম বুঝি আর থাকে না। দিনরাত খোল করতাল আর মৃদঙ্গের রোল। সকলে যেন কীর্ত্তনে মেতে আছে, চীৎকার ক'রে কেবল হরিনাম কচ্ছে। এমন ত কেউ কখনো দেখে নি। দিন দিন তাঁর দল বেড়েই যাচ্ছে। এখনও যদি তাঁকে থামান না যায় শেষে বড়ই মুস্কিল হবে। দয়া ক'রে একটা বিহিত করুন।"

কাজী বললেন—"নিমাই ছেলে মানুষ, কি কচ্ছেন না কচ্ছেন তার ভেতরে আমাদের যাওয়ার দরকার কি?"

প্রথম প্রথম এমনি ক'রেই সমস্ত অভিযোগ তিনি উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু বার বার অভিযোগ হওয়ায় বাধ্য হ'য়ে একদিন সন্ধ্যার সময় দলবল নিয়ে নগরে প্রবেশ করলেন। সকলে তখন কীর্ত্তনে মত্ত, নগরের চারিদিকে হরিনামের রোল আর খোল করতালের শব্দ! নগরময়ই এই ব্যাপার। কোথায় কাকে বারণ করবেন? তাঁর সেপাইরা এক জায়গায় কীর্ত্তন ভেঙে দিলে।

কাজী সাহেব খুব গম্ভীর ভাবে জোর গলায় বললেন—"আজকে বেশী কিছু উৎপাত করলুম না। সাবধান ক'রে দিচ্ছি, ফের যদি কেউ কীর্ত্তন কর তার জাত মেরে দেবো।"

নগরের বহুলোকের মাথায় হঠাৎ যেন বজ্রপাত হ'ল। এ কী বিপদ! এখন উপায়? কাজীর অধীনে বহু সেপাই, তাঁকে কি জোর ক'রে বশ করা সম্ভব? কাকতি-মিনতি ক'রে যে কীর্ত্তনের অনুমতি পাওয়া যাবে সে আশাও নেই।

ভক্তগণ নিরুপায় হ'য়ে এসে উপস্থিত হ'লেন নিমাই পণ্ডিতের কাছে। নিমাই তাঁদের ভরসা দিয়ে বললেন—"তোমরা নির্ভয়ে কীর্ত্তন কর, দেখি কে বাধা দেয়?"

তিনি ত আশ্বাস দিলেন, কিন্তু নগরবাসীদের ভয় গেল না, ভক্তদেরও কিছু কিছু ভয় রইল; কারণ কাজী সেপাই নিয়ে রোজ রাত্রে সমস্ত সহর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

কাজীর পেছনে নগরের বহু হিন্দু ছিল, সুতরাং তাঁর সেপাই আর এই হিন্দুর দল কীর্ত্তনের বিরুদ্ধে। কীর্ত্তন একদম বন্ধ। কেউ বললে, "গোপনেও হরিনাম করা চলে, এর জন্য হৈ চৈ করবার কী দরকার?" আবার কেউ কেউ বা বললে, "কীর্ত্তনই বন্ধ হয় যদি, নগর ত্যাগ ক'রে চ'লে যা'ব, কি লাভ হবে আর এখানে থেকে?"

নিমাই বললেন—"কীর্ত্তন কিছুতেই বন্ধ হবে না। আজই কীর্ত্তন ক'রে নগর ভ্রমণ করব।" নিত্যানন্দকে ডেকে বললেন—"শ্রীপাদ, তুমি নগরময় ঘোষণা কর, সকলে যেন বিকেলে আমার বাড়ীতে আসে। সন্ধ্যার সময়ে কীর্ত্তন করতে করতে বেরুব। প্রত্যেকেই যেন একটা ক'রে দীপ নিয়ে আসে।"

নিতাই নগরময় এ কথা প্রচার করলেন। সকলেই বিচলিত হ'ল। বিকেল হ'তে না-হ'তেই বহু লোক এক একটা দীপ হাতে ক'রে নিমাইয়ের বাড়ী এসে জড় হ'ল। নগরের বহু লোক দীপ নিয়ে যার যার ঘরে প্রস্তুত হ'য়ে রইল, পথে কীর্ত্তনে যোগ দেয়ার জন্য।

নিমাইয়ের শত্রুরা মজা দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রইল। কাজী সাহেবের হুকুমের বিরুদ্ধে কীর্ত্তন! দেখা যাবে নিমাই পণ্ডিতের কত তেজ!

নগরের প্রত্যেক বৈষ্ণবের বাড়ীর দরজায় কলাগাছ রোপণ, আমপাতা দিয়ে জলভরা কলসী স্থাপন করা হ'ল। সন্ধ্যার সময় গৃহ আলোকমালায় সুসজ্জিত করবার আয়োজন করা হ'ল। স্ত্রীলোকেরা খৈ, কড়ি আর বাতাসা সংগ্রহ ক'রে রাখলেন। অথচ কেউ জানে না নিমাই কোন্ পথ দিয়ে যাবেন।

ব্যাপারটা কি সোজা? লক্ষ লক্ষ লোকের কোলাহলে মুখরিত নবদ্বীপে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি না হ'য়েই পারে না; একেবারে হুলস্থূল প'ড়ে গেল!

নিমাই এক একজনকে এক এক দলের কর্ত্তা ক'রে কয়েকটি দল করলেন। একদলের কর্ত্তা অদ্বৈতাচার্য্য, আর একদলের কর্ত্তা শ্রীবাস, আর একটি দলের কর্ত্তা হরিদাস, একদলের কর্ত্তা নিমাই স্বয়ং।

সন্ধ্যা হ'তে না-হ'তেই হাজার হাজার লোকের হাতে হাজার হাজার আলো জ্বলে উঠল। নগরের মধ্যেও প্রত্যেক বৈষ্ণবের গৃহ শত শত প্রদীপ-মালায় আলোকিত হ'ল। একে চাঁদের আলো, তায় আবার লক্ষ লক্ষ দীপের আলোক। সারা নগর এক অপূর্ব্ব শোভায় মণ্ডিত।

অদ্বৈতাচার্য্য বেরুলেন তাঁর দল নিয়ে, তার পরে শ্রীবাস, তারপর হরিদাস। প্রত্যেক দলে নানা দিক থেকে হাজার হাজার লোক এসে যোগ দিল। বহু লোকের হাতে দীপের পরিবর্ত্তে মশাল ছিল। নিমাই এক দল নিয়ে চললেন আত্মহারা ভাবে সকল দলের সামনে। খোল, করতাল, মৃদঙ্গ ও হর্ রোলে আকাশ-বাতাস মুখর। এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিয়ে অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে নিমাই নাচতে নাচতে চ'লেছেন। যত যাচ্ছেন লোক-সংখ্যা ততই বেড়ে যাচ্ছে। নিমাইয়ের অপরূপ লাবণ্যে আর কীর্ত্তনের মধুরতায় শত্রু-মিত্র সকলেই মুগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। যে দেখছে, যে শুনছে তারই যেন একটা তন্ময়তার আবেশ আসছে, কীর্ত্তনের এমনি মিষ্ট মাদকতা। নিমাই পথ দিয়ে নৃত্য ক'রে চ'লেছেন, লক্ষ লক্ষ দৃষ্টি তাঁর প্রতিই নিবদ্ধ, কোন বাড়ী থেকে শ্রাবণের ধারার মত ফুল পড়ছে, কোন বাড়ী থেকে খৈ, কোন বাড়ী থেকে বাতাসা; আর সব বাড়ী থেকেই শুভ শঙ্খনাদ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। সারা নগর এক নতুন ভাবে, নতুন প্রেরণায় টলমল কচ্ছে।

এই যে তন্ময়তা ও চাঞ্চল্য, এর মধ্যেও অনেকের প্রাণ একটা নিশ্চিত আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। নিমাই গঙ্গার তীরের পথ ধ'রে চ'লেছেন কাজী সাহেবের বাড়ীর দিকে। কী সর্ব্বনাশই যে হবে তার ঠিক নেই! তাদের ভয় হ'ল এই যে, কত রক্তারক্তিই যে হবে তার সীমা নেই, একটা অতি ভয়ানক কাণ্ড আর না হ'য়ে যায় না।

কেউ কেউ ভাবছে, 'যাক না দেখি নিমাই পণ্ডিত কাজী সাহেবের কাছে? বুঝবে এখন মজাটা। যা পাঠান সেনা আছে, ঠাণ্ডা ক'রে দেবে'খন। নবদ্বীপে আর কীর্ত্তন হচ্ছে না, আজই শেষ।'

এদিকে ব্যাপার হ'য়েছে কি, কাজী সাহেব প্রথম প্রথম লোকাই

নিয়ে, নগরে টহল দিয়েছিলেন, তারপর বন্ধ ক'রেছিলেন। নিমাই যে হঠাৎ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ে এমন একটা কাণ্ড ক'রে বসবেন, এটা তিনি ধারণাই করতে পারেন নি।

তখন বিভিন্ন রাস্তা ও গলি থেকে নগরবাসীদের বিভিন্ন কীর্ত্তনের দল কাজীর বাড়ীর কাছে আসছে। কাজী সাহেব রোল শুনেই লোক পাঠালেন। লোক গেল, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল। তারপর তিনি এক এক দল পাঠান সেপাই পাঠালেন। এক এক দল সেপাই আসছে আর লক্ষ লক্ষ লোক চারদিক থেকে এসে তাদের ঘিরে ফেলছে। অগণিত লোকের মাঝখানে প'ড়ে তা'রা একটু ভড়কে গেল, তারপর লোকের চাপে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল। হিন্দু আর মুসলমান তখন মিশে গিয়ে এক দলে পরিণত হ'য়েছে।

চারদিক থেকে কীর্ত্তনের দল এসে কাজী সাহেবের বাড়ী ঘিরে ফেললে। কাজীর হ'ল ভয়, ভাবলেন এই উন্মত্ত জনতা তাঁকে মেরেই ফেলবে। তিনি একদম অন্দরমহলে ব'সে কাঁপতে লাগলেন।

কীর্ত্তন থামিয়ে নিমাই পণ্ডিত কাজীর বাইরের বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। কাজী ত ভয়ে ভয়ে নিমাইয়ের সামনে এলেন। নিমাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে তিনি একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। নিমাইয়ের মুখে রাগের, বিরক্তির, হিংসার বা সঙ্কীর্ণতার কোনও চিহ্নই নেই ; এ মুখে এমন একটা বস্তু আছে যা দূরকে নিকট করে, পরকে, জগৎকে আপন করে, যা ভাল না বেসে কেউ পারে না। কী অদ্ভুত মানুষ ইনি !

মুহূর্ত্ত মধ্যে কাজীর মন থেকে সমস্ত ভয়, সন্দেহ, অসন্তোষ কোথায় চ'লে গেল। নিমাই তাঁকে আদর ক'রে বসিয়ে বললেন—"খুব ভদ্দর

লোক আপনি! আমরা এসেছি আপনার বাড়ীতে, আর আপনি গিয়ে ব'সে রইলেন বাড়ীর ভিতরে!"

কাজী অমনি বললেন—"তুমি কি পরের বাড়ী এসেছ? তোমার দাদামশায় নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে আমি বরাবর চাচা ডাকি, তুমি সেই সম্পর্কে আমার ভাগ্নে, তোমাকেও কি অভ্যর্থনা করতে হবে?"

নিমাই বললেন—"বেশ কথা। বলুন দেখি কীর্ত্তন বন্ধ করবার জন্য এত তোড়জোড় ক'রেছিলেন কেন?"

কাজী বললেন—"কী করি বল? প্রথমটায় ত কোন কথাই আমি কানে তুলি নি। তারপর অনেকেই আমায় বললে যে কীর্ত্তন বন্ধ না করলে বাদশা ভয়ানক চটে যাবেন; এ নগরের অনেক হিন্দু মাতব্বর কীর্ত্তন একদম বন্ধ ক'রে দেয়ার জন্য কি আমার কাছে কম হাঁটাহাঁটি ক'রেছে? তা'রা ব'লেছে কীর্ত্তন বন্ধ না করলে হিন্দুধর্ম্ম আর থাকে না। এই সব কারণে আমি বাধ্য হ'য়ে হুকুম দিয়েছি, বুঝলে?"

নিমাই জিজ্ঞেস করলেন—"এখন কী করবেন?"

কাজী উত্তর দিলেন—"আমি বা আমার বংশের কেউ কোন দিন তোমাদের বাধা দেবে না, স্বাধীন ভাবে ধর্ম্ম প্রচার কর।"

নিমাই "হরি বল" ব'লে নৃত্য সুরু করলেন। অমনি লক্ষ কণ্ঠে হরিনাম কীর্ত্তন আরম্ভ হ'ল। কীর্ত্তন করতে করতেই দলবল নিয়ে তিনি ফিরে এলেন। চারদিকে জয়-জয়কার প'ড়ে গেল।

শ্রীবাসের পুত্রশোক

শ্রীবাসের একটি মাত্র ছেলে, বয়সও নেহাৎ কম। ছেলেটির ব্যারাম।

এদিকে তাঁরই বাড়ীতে নিমাই আর ভক্তগণ কীর্ত্তনে বিভোর। শ্রীবাসের অন্তরে আনন্দের আর সীমা নেই।

দাসী এসে শ্রীবাসকে জানালে ছেলেটির অবস্থা খুবই খারাপ। দাসীর সঙ্গেই তিনি বাড়ীর ভিতর গেলেন। গিয়েই দেখলেন যে, ছেলের একেবারে শেষমুহূর্ত্ত উপস্থিত। দেখতে দেখতেই তার শেষ-নিঃশ্বাস পড়ল। শ্রীবাসের স্ত্রী ও বাড়ীর আর স্ত্রীলোকেরা শোকে অস্থির হ'লেন এবং কাঁদবার উপক্রম করতেই শ্রীবাস তাঁদের কাঁদতে বারণ ক'রে বললেন—"তোমরা শোক ক'রো না, শোকই পাপ, আর শোকের ত কোন কারণও নেই। আজ আঙ্গিনায় স্বয়ং নিমাই র'য়েছেন, ভক্তদের নিয়ে মধুর হরিনাম কচ্ছেন। এই হরিনাম শুনতে শুনতে দেহত্যাগ করার মত আনন্দের বিষয় আর কি হ'তে পারে? তোমরা কেঁদ না, দেখ যেন কীর্ত্তনে বাধা না পড়ে, ভক্তরা যেন কেউ টের না পান।"

পুত্রশোকের মত শোক আর নাই। পিতা যদিও শোকের বেগ সংযত করতে পারেন, মা পারেন না। শ্রীবাসের স্ত্রীর পক্ষে সংযত হ'য়ে থাকা অত্যন্ত কঠিন হ'ল। শ্রীবাস তা বুঝতে পেরে বললেন—

"তবু যদি শোক ক'র আর কীর্ত্তনই যদি বন্ধ হয়, আমি ব'লে রাখলুম গঙ্গায় ডুবে মরব।"

শ্রীবাসের স্ত্রী অত্যন্ত ভক্তিমতী। কতক ভক্তিতে আর কতকটা ভয়ে তিনি চুপ ক'রে রইলেন। অন্যকেও কাজেই চুপ ক'রে থাকতে হ'ল।

মরা ছেলে শুইয়ে রেখে শ্রীবাস আঙ্গিনায় এসে আবার নৃত্য সুরু করলেন। কেউ কিছু টের পেলেন না। বিনা বাধায় কীর্ত্তন চলল।

সন্ধ্যার কিছু পরেই ছেলেটি মারা গেছে। তারপর রাত দুপুর পার হ'য়ে গেছে। অমন একটা দুঃসংবাদ কতক্ষণ চাপা থাকে? ভক্তদের মধ্যে দু'এক জন টের পেলেন। যিনিই টের পেলেন তিনিই স্তম্ভিত, তাঁরই নৃত্য-গীত বন্ধ হ'ল। তারপর একে একে প্রায় সকলেই জানলেন, সুতরাং খোল ও করতালও গেল থেমে।

নিমাই জিজ্ঞেস করলেন—"আমার মনটা কেমন কচ্ছে। কি হ'য়েছে বল ত।"

কেউ আর সাহস ক'রে কিছু বলছেন না। নিমাই আবার জিজ্ঞেস করায় ভক্তগণ বললেন,—"শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যু হ'য়েছে।"

নিমাই চমকে উঠে বললেন—"কখন?"

—"সন্ধ্যার কিছু পরেই।"

তিনি চেয়ে দেখলেন শ্রীবাস ভগবানের ধ্যানে বিভোর, মুখখানা আনন্দের জ্যোতিতে উজ্জ্বল। নিমাইয়ের দু'চোখ দিয়ে ধারা বইছে।

তাঁর চোখে জল দেখেই শ্রীবাস বললেন—"ঠাকুর, পুত্রশোক সইতে পারি, কিন্তু তোমার চোখের জল যে সইতে পারি না।"

নিমাই বললেন—"ধন্য তুমি, ধন্য তুমি শ্রীবাস।" চোখের জল তাঁর বাধা মানলে না। নিতান্ত বিহ্বলভাবে আপনা-আপনি তিনি বললেন—"শ্রীবাসের মত এমন মানুষকে ছেড়ে যা'ব কি ক'রে? ছেড়ে যেতে হবে মনে ক'রে যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।" ব'লেই তিনি আবার কেঁদে ফেললেন। শ্রীবাস তাঁকে শান্ত করলেন।

ভক্তগণ মরা ছেলেটিকে ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে এলেন এবং হরিনাম করতে লাগলেন।

নিমাই বললেন—"শ্রীবাস, সংসারের দণ্ডে মহাপুরুষরাও ক্লেশ পান, কিন্তু তুমি সে সকল মহাপুরুষেরও ঢের উর্দ্ধে। তবু যখন সংসারেই তোমাকে আসতে হ'য়েছে সংসারের নিয়মও তোমাকে মানতে হবে। তাই তোমাকে বলি, যেমন তোমার এক ছেলে চ'লে গেছে, তেমনি নিতাই আর আমি তোমার দুই ছেলে র'য়েছি। আমরাই তোমার ছেলে।"

ভক্তরা অমনি হরিধ্বনি ক'রে উঠলেন এবং তারপরই সেই মৃত বালককে শ্মশানে নিয়ে গেলেন।

শোক দু'চার দিনে সকলেই ভুললেন, কিন্তু নিমাইয়ের একটি কথা কেউই ভুললেন না, কারণ কথাটা সকলের অন্তরে যেন দাগ কেটে ব'সে গিয়েছিল। কথাটা এই—"এমন মানুষকে ছেড়ে যা'ব কি ক'রে?" সকলেই ভাবতে লাগলেন নিমাই কেন এমন কথা বললেন?

আগমবাগীশের কাণ্ড

কৃষ্ণানন্দ খুব বড় পণ্ডিত। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর মত বড় পণ্ডিত বাংলাদেশে আর হয় নি। ন্যায়শাস্ত্রে যেমন রঘুনাথ, স্মৃতিশাস্ত্রে যেমন রঘুনন্দন, তন্ত্রে তেমনি কৃষ্ণানন্দ। তাঁর উপাধি ছিল আগমবাগীশ। আগমবাগীশ বললেই লোকে তাঁকেই বুঝত।

নিমাই আর তিনি একসঙ্গে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়তেন। পড়ার সময়ে তাঁদের খুব ভাবও ছিল।

নবদ্বীপে তখন বহু পণ্ডিত আর বহু আচার্য্য বাস করতেন। নিমাইও একজন পণ্ডিত ও আচার্য্য। তিনি বড় সাধু হ'য়েছেন, মহাপুরুষ হ'য়েছেন, নিজের মত চালিয়ে বহু ভক্ত আর শিষ্য ক'রে ফেলেছেন, এটা অনেক পণ্ডিতেরই সহ্য হ'ল না। এই জন্যই অনেক পণ্ডিত নিমাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজের মত চালাতে এবং দলবল বাড়াতে অনেকেই চেষ্টা করতেন ত।

আগমবাগীশ ভাবলেন, 'নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে একত্রে লেখাপড়া কল্লুম, খেলাধূলো কল্লুম, এই সেদিন পণ্ডিত হ'ল, চারদিকে শুনতে পাচ্ছি সে একেবারে ভগবানের অবতার হ'য়ে ব'সেছে!" একদিন নেহাৎ যেতেই হ'ল তার কাছে, দেখি তার হরিভজা বন্ধ করা যায় কিনা। এমন অশাস্ত্রীয় ব্যাপার ত কোথাও দেখা যায় নি।'

আগমবাগীশের কাণ্ড

এদিকে নিমাই তাঁর বাড়ীতে নিজের ভাবে বিভোর হ'য়ে আছেন। ভাবছেন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আছেন, আর তিনি সারা রাত জেগে ব'সে আছেন রাধিকার মত ব্যাকুল প্রতীক্ষায় অথচ কৃষ্ণ আসছেন না। কী নিষ্ঠুর এই কৃষ্ণ! এই ভাবছেন আর কৃষ্ণনামের বদলে তখন 'গোপী-নাম' জপ কচ্ছেন। ভক্তরা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

ঠিক এই সময়েই ঘরে প্রবেশ করলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। মনে ক'রেছিলেন শাস্ত্রের তর্ক ক'রে নিমাইকে দেবেন হারিয়ে। কিন্তু ঘরে ঢুকে নিমাইয়ের হাসিমাখা আনন্দভরা প্রশান্ত মুখ দেখে কিছু বলবার সুযোগ পেলেন না। নিমাইয়ের মুখে চোখে তঁ কোথাও অভিমান অহঙ্কার, অসন্তোষের চিহ্নমাত্র নেই।

আগমবাগীশ কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি এসে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে অমনি চ'লে যাবেন সে পাত্রই তিনি নন। তাঁর কথা কওয়ার একটি সুযোগও হ'ল, কাজেই তিনি ভাবলেন এতগুলো লোকের সামনে উপদেশ না দিয়ে গেলে কি তাঁর মত লোকের মান রক্ষা হয়!

খানিকক্ষণ পরেই আগমবাগীশ বললেন—"নিমাই, তুমি গোপীনাম কচ্ছ কেন? কোন্ শাস্ত্রে এ ব্যবস্থা আছে?"

সহপাঠী হ'লেও ভাবে আত্মহারা নিমাই তাঁকে চিনতে পারলেন না, কথাও কইলেন না।

আগমবাগীশ আবার বললেন—"অশাস্ত্রীয় কাজ ক'রো না, গোপী-নামের ব্যবস্থা কোন শাস্ত্রে নেই, কৃষ্ণনাম করতে পার।"

আত্মহারা নিমাই অমনি ব'লে উঠলেন—"কৃষ্ণ? কৃষ্ণ ভারি নিষ্ঠুর।"

আগমবাগীশ বললেন—"অমন কথা ব'লো না। কৃষ্ণনিন্দা মহাপাপ।"

নিমাই বললেন—"তুমি বুঝি কৃষ্ণের পক্ষের লোক? মথুরা থেকে এসেছ? বেরোও এখান থেকে।"

আগমবাগীশ নিমাইয়ের ভাব বুঝলেন না। তাঁকে যে সত্যিই কৃষ্ণের পক্ষের লোক মনে ক'রে নিমাই ওকথা ব'লেছেন তিনি তা ধারণা করতে পারলেন না।

নিমাই এবার রেগে বললেন—"তুমি সহজে যাবে না বুঝতে পাচ্ছি, আচ্ছা তাড়াচ্ছি তোমাকে।"

কাছে ছিল একটা লাঠি, খপ ক'রে সেই লাঠিটা নিয়ে নিমাই করলেন তাড়া। একে ত তাঁর দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, তার ওপরে লাঠি নিয়ে মারতে ছুটে এসেছেন। কাজেই আগমবাগীশ "বাবারে, মেরে ফেললে রে" ব'লে চীৎকার ক'রে দৌড় দিলেন প্রাণপণ জোরে।

হাঁপাতে হাঁপাতে একেবারে বাড়ী গিয়ে অবশ হ'য়ে পড়লেন। পথে একবারও তিনি আর পিছন ফিরে তাকান নি। যদি তাকাতেন তা হ'লে দেখতেন যে তাঁর পিছনে কেউ নেই। নিমাই লাঠি নিয়ে তাড়া ক'রেছিলেন বটে, কিন্তু তা ঘর পর্য্যন্তই।

আগমবাগীশের বাড়ীতে তাঁর দলের বহু লোক ছিলেন। তাঁরা ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন—"কী হ'ল? ব্যাপার কি?"

একটু দম নিয়ে সুস্থ হ'য়ে আগমবাগীশ বললেন—"বড্ড বেঁচে এসেছি বাবা। আজ ব্রাহ্মণবধ হ'য়েছিল আর কি! ছিঃ ছিঃ ছিঃ এমন জায়গায়ও মানুষ যায়? যে কোন রকমেই হোক্ এর একবার শোধ তুলতেই হবে। আচ্ছা বল দেখি নিমাই পণ্ডিত কি দেশের রাজা?"

—"আজ্ঞে ব্যাপারটা ত বুঝতে পারলুম না।"

আগমবাগীশ বললেন—"নিমাই পণ্ডিত ভারি ভক্ত হ'য়েছে শুনে গিয়েছিলুম তাঁকে দেখতে। একসঙ্গে প'ড়েছি ত। গিয়ে দেখি কতকগুলো অকাল-কুষ্মাণ্ড তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে, আর নিমাই গোপীনাম জপ কচ্ছে। তারপর যা কেষ্ট নিন্দে করলে তা শুনলেও পাপ হয়। আমি যাই গোপীনাম ও কেষ্ট নিন্দা করতে বারণ কল্লুম, অমনি ইয়া মোটা একটা লাঠি নিয়ে এল আমায় মেরে বাড়ী থেকে বের ক'রে দিতে। বাপ-ঠাকুরদার পুণ্য-ফলেই আজ বেঁচে এসেছি।"

তাঁর এই বিবরণ শুনে তাঁর সঙ্গীদের ত রাগ হওয়ারই কথা। একজন বললেন—"নিমাই পণ্ডিতের ত দেখছি বড্ড বেশী আস্পদ্ধা, ব্রাহ্মণকে মারতে আসে।"

আর একজন বললেন—"শচীর বেটা আবার একটা অবতার হ'য়ে গেল!"

অপর একজন বললেন—"নিমাই পণ্ডিত কি দেশের রাজা নাকি যে, লাঠি নিয়ে মারতে আসে?"

শেষে একজন বললেন—"নিমাই পণ্ডিতই যদি মারতে আসে আমরাও তাঁকে মেরে ঠাণ্ডা ক'রে দেবো। বেদম মার দিতে পারলেই অবতার-গিরি বেরিয়ে যাবে এখন।"

নিমাই পণ্ডিতকে মারবার পরামর্শ হ'ল।

এদিকে লাঠি নিয়ে তেড়ে গিয়েই নিমাইয়ের বাইরের জ্ঞান ফিরে এল। তাঁর মনে ভারি দুঃখ হ'ল। তাঁর হাতে লাঠি! ছিঃ ছিঃ ছিঃ কী ক'রে এমন কাজ কল্লুম? এই ভেবে নিতান্ত বিষণ্ণ হ'লেন।

তাঁকে প্রহার করবার ষড়যন্ত্রের কথা ক্রমে ক্রমে তাঁর কানে এল। নিত্যানন্দকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"এ কথা শুনেছেন কি যে, নগরে কতক লোক আমাকে প্রহার করবার জন্য ষড়যন্ত্র কচ্ছে?"

নিত্যানন্দ শুনেছিলেন, কিন্তু চুপ ক'রেই রইলেন।

নিমাই বললেন—"আমাকে যারা প্রহার করতে চায় আমি তাদের জানি। আমার ওপরে তাদের বড্ড রাগ। এই রাগ আমি দূর করব। সংসারের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে সন্ন্যাসী হ'য়ে তাদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করব। আমার ভিখারীর অবস্থা দেখলে আর তাদের রাগ থাকবে না, আমার ওপর তাদের দয়া হবেই। দয়া হ'লে তা'রা হরিনাম গ্রহণ করবে।"

নিত্যানন্দের মনে একটা আশঙ্কা হ'ল নিমাই সংসার ত্যাগ করবেন; কিন্তু নিমাইয়ের এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রেই রইলেন; তাঁর দু' চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়তে লাগল।

শচীদেবীর ভয়

শচীদেবী তাঁর ভগ্নী চন্দ্রশেখরের পত্নীকে সকালবেলা ডেকে পাঠালেন পরামর্শ করবার জন্য। ভগ্নী এলেন বিকালবেলা।

শচীদেবী জিজ্ঞেস করলেন—"শুনেছ আমার নিমাই নাকি—"

ভগ্নী ব্যাকুলভাবে বললেন—"নিমাই কী করবে?"

শচীদেবী বললেন—"নিমাই নাকি আমায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে যাবে, সন্ন্যাসী হবে।"

তিনি আর বলতে পারলেন না, কেঁদে ফেললেন। একেই তাঁর মনে সর্ব্বদা একটা অশান্তি। আট আটটি কন্যার শোক তিনি ভুলেছিলেন বিশ্বরূপকে পেয়ে; আর সেই বিশ্বরূপ যখন তাঁর বুক ভেঙে দিয়ে পালিয়ে গেলেন, তখন শুধু নিমাইয়ের মুখের দিকে চেয়েই তিনি বাঁচতে পেরেছিলেন। তিনি বিধবা, অত্যন্ত বুড়ো হ'য়েছেন, অন্ধের যষ্টীর মত নিমাইকে অবলম্বন ক'রেই র'য়েছেন। সেই নিমাই কীর্ত্তন করেন, ভাবে বিভোর হ'য়ে থাকেন, সন্ন্যাসী পেলেই তাঁর আনন্দের সীমা থাকে না, এ সব শচীদেবীর ভাল লাগে না। সর্ব্বদাই তাঁর এই ভয়, যদি কোন সন্ন্যাসী নিমাইকে বের ক'রে নিয়ে যায়। তিনি চান নিমাই সংসারী হ'য়ে ঘরে থাকুন।

একে ত এই অবস্থায় আছেন, তাতে আবার নানা লোকের কাছে শুনতে পাচ্ছেন নিমাই শীঘ্রই সন্ন্যাস নেবেন। ভক্তদের কাছে নিমাই

তাঁর মনের সঙ্কল্প প্রকাশ ক'রেছেন, তাঁদের কাছে অন্য লোকও শুনেছেন, কাজেই নবদ্বীপের সকলেই একথা জানেন। এই সময়ে এলেন বিখ্যাত সন্ন্যাসী কেশব ভারতী।

কেশব ভারতী কাটোয়ায় গঙ্গার তীরে বটতলায় থাকেন; মহাজ্ঞানী, তেজস্বী ব্রাহ্মণ। তাঁকে দেখেই শচীদেবীর বুকটা দুরু দুরু ক'রে উঠল। তাঁর প্রতি নিমাইয়ের অসাধারণ ভক্তি, তিনিই বুঝি নিমাইকে ঘর ছাড়া করেন। তাঁর অশান্ত মন কিছুতেই স্থির রাখতে না পেরে ভগ্নীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

ভগ্নী বললেন—"এক কাজ কর, নিমাইকেই ডেকে পষ্টাপষ্টি জিজ্ঞেস কর।"

শচীদেবী নিমাইকে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করলেন—"নিমাই, এসব কী শুনছি? তুমি নাকি সংসার ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবে? তোমার মুখের দিকে চেয়েই যে প্রাণ রেখেছি বাবা।"

নিমাই বললেন—"মা, তোমার মত মা পাওয়া সব চেয়ে বড় ভাগ্য, অথচ তোমার প্রতি আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করতে পাচ্ছি না। আমি স্ববশে নেই মা, নিজের ইচ্ছায়ই সব করতে পারি না, তাই একটা তীর্থভ্রমণ করলে ভাল হয়। তা, তীর্থেই যাই আর যেখানেই যাই তোমাকে না ব'লে, তোমার অনুমতি না নিয়ে, আমি কোথাও যা'ব না মা।"

মা অনেকটা আশ্বস্ত হ'লেন। নিমাই ঘর ছাড়লেও তাঁর অনুমতি নেবেন। তিনি ত আগেই জানতে পারবেন।

শচীদেবী বললেন,—"দেখ নিমাই, আজ তোমায় একটা কথা বলি। কথাটা প্রায়ই মনে পড়ে। বিশ্বরূপ আমার হাতে একখানা পুঁথি

দিয়ে ব'লেছিল, 'মা, নিমাই বড় হ'লে তাকে এই পুঁথিখানা পড়তে দিও,' আমি বল্লুম, 'তুই নিজেই ত নিমাইকে দিতে পারিস,' তাতে সে বললে, 'মা, বাঁচা মরার কথা ত কিছু বলা যায় না।' পুঁথিখানা নিয়ে রেখে দিলুম।"

নিমাই খুব ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন—"দাও মা সেই পুঁথিখানা, দাদার একমাত্র চিহ্ন।"

শচীদেবী বললেন—"পুঁথি প'ড়েই বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছে, পাছে তুমিও প'ড়ে আমার সর্ব্বনাশ কর, এই ভয়ে সে পুঁথি আমি পুড়িয়ে ফেলেছি।"

নিমাইয়ের মুখ কালো হ'য়ে উঠল। শচীর বুকে বড় ব্যথা লাগল। তিনি বললেন—"বাবা, রাগ ক'রো না, আমার অপরাধ হ'য়েছে, আমাকে ক্ষমা কর।"

নিমাই বললেন—"এ তোমার ভারি অন্যায় মা। তুমি আমার মা, তোমার কি কোন অপরাধ হ'তে পারে? তুমি শান্ত হও মা।"

শচীদেবী বললেন—"শান্ত হ'তে ত বলছ বাবা, পষ্ট ক'রে বল আমায় ভাড়াচ্ছ না।"

নিমাই বললেন—"না মা।"

শচীদেবী বললেন—"তবে সেদিন কেশব ভারতীকে অত ভক্তি দেখালে কেন, অত আদর করলে কেন?"

নিমাই বললেন—"মা, ভারতী ঠাকুর পরম ভক্ত, তাই তাঁকে অত আদর ক'রেছি। তোমায় ত ব'লেছি মা, তোমার অনুমতি না নিয়ে কোথাও যা'ব না। যেখানেই যাই তোমার কাছে আবার আসব

শচীদেবী বললেন—"তবে কি সতিই কোনখানে যেতে চাও নাকি ?"

নিমাই উত্তর দিলেন—"ইচ্ছা আছে কোন এক তীর্থস্থান দর্শন করব।"

শচীদেবী বললেন—"তোমাকে দেখতে না পেলে যে আমি ম'রে যা'ব বাবা।"

নিমাই বললেন—"মা, তোমার দুঃখ কিসের ? তোমার হৃদয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আছেন।"

শচীদেবী বললেন—"তুমি ত বাবা তা-ই বল, কিন্তু আমি ত ভিতরে বাইরে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখি না। জেগে যখন থাকি তখন, আর ঘুমিয়ে যখন থাকি তখনও তোমার মুখ ছাড়া আর যে কিছু দেখতে পাই না বাবা। আমার বুকে শেল মেরে কোথাও যেও না বাবা।"

নিমাই বললেন—"তুমি নিশ্চিন্ত হও মা। তোমায় না ব'লে কোথাও যা'ব না।"

মায়ের অনুমতি

নিমাইয়ের কাছে গিয়ে শচীদেবী জিজ্ঞেস করলেন—"হ্যাঁরে নিমাই, কি শুনছি?"

নিমাই কি রকম বিভোর হ'য়েছিলেন, মার কথা কানে যেতেই সে ভাব কেটে গেল। তিনি বললেন—"কি মা?"

শচীদেবী বললেন—"সকলে বলাবলি কচ্ছে তুমি নাকি সন্ন্যাস নিতে যাচ্ছ? সকলের কাছে, বিশেষ ক'রে তোমার ভক্তদের কাছে বিদায় নিয়েছ? এ কি সত্যি কথা নিমাই?"

একটু কাল মাথা হেঁট ক'রে থেকে নিমাই আস্তে আস্তে বললেন—"তুমি আমাকে জিজ্ঞেস ক'রে ভালই ক'রেছ মা, তোমার অনুমতি পেলেই যেতে পারি।"

শচীর বুকে কে যেন প্রচণ্ড বলে শেল মারলে। তবে ত নিমাই সত্য সত্যই চলল, এ দুঃখ তিনি সইবেন কেমন ক'রে? নিমাই তাঁকে নানারকমে সান্ত্বনা দিলেন; বললেন—"মা, আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্যই যা'ব, কোন অমঙ্গল হবে না মা, তুমি আনন্দের সহিত অনুমতি দাও।"

মা বললেন—"নিমাই, আমার বড় সাধ ছিল যে তোমাকে নিয়ে এখানে থাকব, তুমি সংসারী হবে, তোমার ছেলেমেয়ে হবে, তাই

নিয়ে আমি শেষজীবনে একটু শান্তি পা'ব; আমার সে সাধ আর মিটল না।"

নিমাই বললেন—"মা, তুমি বুড়ো হ'য়েছ, এই সময়েই অতি যত্নের সহিত তোমার সেবা করা আমার সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য, কিন্তু আমি তোমার বৃথা পুত্র। আমি আমার নিজের বশে নেই, আমায় বাইরে টেনেছে, থাকতে পাচ্ছি না মা।"

ভগবানের লীলা মানুষ বোঝে না, বুঝতে পারেও না, তাই শচীদেবী মা হ'য়েও এ অবস্থায় অচেতনও হ'লেন না, কেঁদেও একেবারে অস্থির হ'লেন না, নিমাইকে দিব্যি জিজ্ঞেস করলেন—"নিমাই, লোকে বলে সন্ন্যাসীরা নিজের বাপকে বাপ বলে না, মাকেও মা বলে না, সে কি সত্যি নাকি রে?"

নিমাই বললেন—"তা কি হয় মা? তোমাকে মা বলব না? তোমাকে ভুলব? সে সন্ন্যাসের মুখে ছাই। এমন সন্ন্যাস আমি চাই না। যেখানেই যা'ব সেখানেই তোমার চিন্তা আমি করবই, কোন অবস্থায়ই তোমাকে ভুলব না। লোকে ধন উপার্জ্জন করবার জন্য দূর দেশে যায়, আবার ফিরে আসে, আপনার জনকে দেয়, আমিও তেমনি যাচ্ছি, আমি যা আনব সকলকে দেবো। মা, তুমি অনুমতি দাও, জেনো আমার মঙ্গলের জন্যই যাচ্ছি, তুমি ত আমারই মঙ্গল সকলের চেয়ে বেশী চাও।"

ছেলের মঙ্গলের জন্য মা পারেন না এমন কোন কাজ নেই। নিমাইয়ের মঙ্গল হবে, কাজেই তিনি এবার অনেকটা শান্ত হ'য়ে বললেন—"নিমাই, আমি না হয় তোমায় অনুমতি দিলাম, তোমার মঙ্গল হবে এতে আমি বাধা দেবো না; কিন্তু আমার বিষ্ণুপ্রিয়া?"

নিমাই বললেন—"তার তত দুঃখ হবে না মা। আমি ত নিষ্ঠুর হ'য়ে তাকে ত্যাগ কচ্ছি না, নিজের সুখের জন্যও যাচ্ছি না, আমি চিরকালের জন্যও যাচ্ছি না। আমি একটু দূরে থাকব, এই মাত্র। যে পথে যাচ্ছি তাতে তার ভালই হবে, সুতরাং তার তত দুঃখ হওয়ার কারণ নেই। তার জন্যে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। সে রইল, আমার হ'য়ে তোমার সেবা করবে, আমার কথা তোমাকে সে স্মরণ করিয়ে দেবে, আর তুমিও আমার কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।"

শচীদেবী বললেন—"নিমাই, তোমার এ কি ধর্ম্ম বুঝতে পারি না। তোমার সর্ব্বজীবে দয়া, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া আর আমার ওপর তোমার দয়া নেই!"

নিমাই বললেন—"ক্ষমা কর মা, তোমার এ অবস্থা দেখলে আমার বুক ফেটে যায়। মা, আমার অত্যাচার তুমি সইবে না ত কে সইবে? তুমি আমায় আনন্দে বিদায় দাও।"

ভগবানেরই ইচ্ছায় তখন শচীদেবীর ভাবান্তর উপস্থিত হ'ল, তিনি দেখছেন সর্ব্বজীবের প্রাণেই ভগবান, জীবের সহিত ভগবানের অতি নিবিড় সম্বন্ধ। নিমাই সন্ন্যাসী হ'য়ে জগতের সকলের মুক্তি দেবেন, হরিনাম প্রচার করবেন। ভাবছেন 'আমি নিমাইয়ের মা, এর চেয়ে বড় ভাগ্য আর কী হ'তে পারে? নিমাই সন্ন্যাস নিয়ে জীবের দ্বারে দ্বারে ভগবানের নাম প্রচার করুক, জীব উদ্ধার হোক।'

শচীদেবী বললেন—"নিমাই, আমি তোমায় মনের সুখে অনুমতি দিচ্ছি তুমি সন্ন্যাস কর।" ব'লেই তাঁর ভাবান্তর হ'ল। এতক্ষণ যেন তাঁর জ্ঞান ছিল না, এখন যেন জ্ঞান ফিরে পেলেন, বললেন—

কি বললুম! নিমাই, আমিই তোমাকে পথের ভিখারী ক'রে দিলুম। দেখ আমি তোমার কেমন মা।"

শচী ধুলোয় প'ড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন।

নিমাই অমনি মাকে তুলে নিজের গায়ে ঠেস্ দিয়ে বসালেন; বললেন—"অনুমতি কি তুমি দিয়েছ মা? ভগবান দিয়েছেন তোমার মুখ দিয়ে। কেঁদ না মা। আমি আবার আসব। তোমায় ভুলে আমি থাকতে পারব কেন? যে সন্ন্যাসে মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না, সে সন্ন্যাসের মুখে ছাই। যা করতে বলবে তাই করব, যেখানে থাকতে বলবে সেখানে থাকব।" ব'লে মায়ের গলা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগলেন, আর মা আঁচল দিয়ে তাঁর চোখের জল মুছে দিলেন।

শচীদেবী কিন্তু একথা বললেন না, 'তুমি বাড়ীতেই থাক, বা কাছা-কাছি কোন এক জায়গায় থাক।' সাধারণ মা হ'লে তেমনি একটা কিছু বলতেন। এমন মা ব'লেই তাঁর ছেলে নিমাই।

বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুমতি

বিষ্ণুপ্রিয়া র'য়েছেন বাপের বাড়ী। সেখানে কানাঘুষা
নিমাই সন্ন্যাসী হবেন। বুকটা দুর দুর ক'রে উঠল, কাজেই তাড়াতাড়ি
চ'লে এলেন নিমাইয়ের বাড়ীতে।

নিমাই শুয়ে আছেন, খুব ঘুম; বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর পায়ে হাত
দিয়ে ব'সে কাঁদছেন। কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু পড়ল নিমাইয়ের
পায়ে, আর তাঁর ঘুম গেল ভেঙে। বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের দিকে চেয়েই
তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"কাঁদছ কেন ?"

বিষ্ণুপ্রিয়া অতি কষ্টে বললেন—"তোমার দাদা যা ক'রেছিলেন
তুমিও নাকি তাই করবে ?"

নিমাই বললেন—"কে বললে ?"

বিষ্ণুপ্রিয়া। "আমার মাথা খাও, সত্যি ক'রে বল।"

নিমাই। "যখন যেখানে যা'ব তোমার অনুমতি নিয়েই যা'ব।"

বিষ্ণুপ্রিয়া। "তা যা-ই বল, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি
ভেতরে ভেতরে কাঁদছ।"

নিমাই। "দেখ তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমার নামটা সার্থক
কর। তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর, আমিও করি, কেমন ?"

বিষ্ণুপ্রিয়া স্পষ্টই বুঝলেন যে, তাঁদের বিচ্ছেদের আর বেশী

বিলম্ব নেই; বললেন—"তুমি বাড়ী ছেড়ে যেও না, আমি না হয় বাপের বাড়ী থাকব। তুমি গেলে মা আর বাঁচবেন না, লোকেও তোমার নিন্দা করবে।"

নিমাই। "তুমি ঠিকই বুঝেছ। আমি তোমায় দুঃখ দিচ্ছি, নিজেও দুঃখ পাচ্ছি, কিন্তু ইচ্ছে ক'রে কিছুই কচ্ছি না। যে পথে আমি যেতে চাই তাতে তোমার মঙ্গলই হবে, আমারও মঙ্গল হবে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া। "তোমার মনে আছে বিয়ের রাত্রিতে যে আমার পায়ে হুঁচোট লেগেছিল? আমার কপালে যে অশেষ দুঃখ আছে তা তখনই মনে হ'য়েছিল। আমার যা হবার সে ত বুঝতেই পাচ্ছি, তুমি মাকে এমনি ক'রে মেরে যেও না।"

নিমাই। "মা আমাকে অনুমতি দিয়েছেন এবং আনন্দের সহিতই দিয়েছেন।"

বিষ্ণুপ্রিয়া। "মা অনুমতি দিয়েছেন! তা দিতেও পারেন, তিনি আর ক'দিন বাঁচবেন? তিনি না থাকলে আমার কি উপায় হবে? আমায় কে রক্ষা করবে? আমায় সকলে দোষ দেবে, হতভাগিনী কালসাপিনী ব'লে নিন্দা করবে।"

ভগবানেরই ইচ্ছায় শচীদেবীর মতই বিষ্ণুপ্রিয়ারও ভাবান্তর হ'ল। নিমাই বললেন—"ঘরে থাকলে আমি বাঁচব না, আমায় ছেড়ে দাও, বৃন্দাবনে যাই, নইলে বাঁচব না।"

বিষ্ণুপ্রিয়া। "বৃন্দাবনে গেলে যদি সুখী হও তবে যাও, বাধা দেবো না; কিন্তু আমাকেও সঙ্গে নাও। রামও সীতাকে নিয়ে বনে গিয়েছিলেন।"

নিমাই। "তোমাকে নিয়ে গেলে সন্ন্যাস হবে না। আমি

তোমার, যেখানেই যাই সেইখানেই তোমার। তোমার মনে আমি থাকবই, আমার শরীরটা কেবল একটু দূরে থাকবে। এ ত বিচ্ছেদ নয়। জীবের দুঃখে অসীম দুঃখ পাচ্ছি, সে দুঃখ দূর করতে তুমিই আমার সব চেয়ে বড় সহায়। তুমি সতী, আমায় বাধা দিও না।"

এই ব'লে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত দুটি ধরলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া অচেতন হ'য়ে পড়লেন। তাঁকে তুলে অনেকক্ষণ যত্ন করার পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এল।

বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদতে কাঁদতে বললেন—"তুমি আমায় দাসী ক'রেছিলে আমি যেন চিরদিন তোমার দাসী থাকতে পাই। তুমি জীবের কল্যাণ করবে, তাতে আমার যত দুঃখই হোক, আমি মাথা পেতে নেব। তুমি শুধু এইটুকু কর যেন এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার ঐ চরণ থেকে আমার চিত্ত বিচলিত না হয়।"

নিমাই বললেন—"তাই হবে গো তাই হবে। আমিও তোমাকে কখনও ভুলব না, তোমাকে ভোলা অসম্ভব।"

যাবার আগে

দিনের পর দিন যায়। নিমাই খুব ভোরে ওঠেন, পূজা-আহ্নিক করেন, নিয়মিত আহার ক'রে বিশ্রাম করেন। শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে বহুক্ষণ থাকেন। কীর্ত্তনে আর আগের মত বিভোর হন না; দিব্যি সংসারী।

শচীদেবী বেশ আনন্দে আছেন। বাড়ীতে লোকের সমারোহ। বিষ্ণুপ্রিয়া আর তিনি রান্না করেন, বহু লোককে খাওয়ান দাওয়ান। সংসারে কিছু মাত্র অভাব নেই। ভক্তরা কত রকমের জিনিষ এনে ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। দিন বেশ কাটতে লাগল।

নিমাই আবার আগের মত বেড়াতে যান রোজ বিকেলে ভক্তদের নিয়ে। দেড় মাস এমনি ক'রে কেটে গেল। তখন তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণের আশঙ্কা সকলেরই হ্রাস পেতে লাগল, আরও কয়েকদিনে সকলেই তাঁর সংসারত্যাগের কথা অনেকটা ভুলে গেলেন।

পৌষ মাস কেটে গেছে। মাঘের প্রচণ্ড শীত। ভোরবেলা থেকে নিয়মিত ভাবে নিমাই সব কাজই ক'রেছেন। বিকেলবেলা নবদ্বীপের বাজারের সেই দরিদ্র শ্রীধর এসে উপস্থিত। নিমাইয়ের জন্য সে একটি লাউ নিয়ে এসেছে।

নিমাই মাকে ডেকে বললেন—"শ্রীধর বড় চমৎকার একটি লাউ এনেছে মা, আজকে লাউয়ের পায়েস রেঁধে দাও।"

শচীদেবী লাউয়ের পায়েস ত রাঁধলেনই, আরও অনেক কিছুই রাঁধলেন।

রাত্রি হ'য়েছে। নিমাই আহারে ব'সেছেন, মা সামনে ব'সে 'একটা

খা, ওটা খা' ব'লে খাওয়াচ্ছেন। মায়ের সঙ্গে প্রাণ খুলে গ[illegible] করতে করতে নিমাই অন্য দিনের চেয়ে ঢের বেশী আহার করলেন।

শচীদেবী নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। নিমাই আ[illegible] আর ঘুমোন নি। বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরে ঢুকে নিমাইকে বড়ই প্রফুল্ল [illegible] বললেন—"দেখ, বহুদিন থেকেই আমার মনে একটা সাধ ছিল, [illegible] যদি হুকুম দাও ত সে সাধ মেটাতে পারি।"

নিমাই জিজ্ঞেস করলেন—"কি সাধ শুনি?"

বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন—"আমি তোমাকে আজ সাজাব।"

নিমাই বললেন—"আচ্ছা, অনুমতি দিলুম, কিন্তু আমিও তোমাকে সাজাব, রাজী আছ কিনা বল।"

বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন—"আচ্ছা রাজী আছি।"

চন্দন দিয়ে বেশ ক'রে সাজিয়ে তিনি নিমাইয়ের গলায় একগাছা মালতীর মালা পরিয়ে দিলেন।

নিমাই বললেন—"এবার কিন্তু আমার পালা।"

এমন ক'রেই তিনি সাজালেন যে বিষ্ণুপ্রিয়ার অতি অপরূপ রূপ ফুটে উঠল।

প্রদীপ নিবিয়ে দিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুমুলেন।

ছ'দণ্ড রাত্রি আছে। নিমাই অতি আস্তে আস্তে উঠলেন, আর নিজের মাথার বালিশটা বিষ্ণুপ্রিয়ার বুকের কাছে রাখলেন। তারপর অতি সাবধানে দরজা খুলে মনে মনে মাকে প্রণাম ক'রে, বিশ্বরূপের মত, গঙ্গার তীরে গেলেন। পার হওয়ার অন্য কোন সুযোগ নেই দেখে সেই কন্‌কনে শীতের রাত্রে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন।

"শূন্য যে শয্যা, শূন্য যে ঘর"

বিষ্ণুপ্রিয়া চমকে উঠলেন। বিছানায় হাত বুলিয়ে দেখলেন নিমাই নেই। তিনি উঠে বসলেন, দেখলেন ঘরের দরজা খোলা। তাই ত! গেলেন কোথা? কোনখানে একটু টু শব্দও হচ্ছে না। এবার ঘোর সন্দেহ হ'ল। আমাদের ছেড়েই গেলেন নাকি! ভাবতে ভাবতে আশঙ্কা ক্রমেই বেড়ে চলল।

আর বিলম্ব না ক'রে বিষ্ণুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি শচীদেবীর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন—"মা ওঠ, শীগগির ওঠ মা।"

শচীদেবীর চোখে ত ঘুম নেই বললেই চলে। ডাক শুনেই চমকে উঠে তিনি বললেন—"বিষ্ণুপ্রিয়া নাকি? কি হ'য়েছে মা? নিমাইয়ের খবর কি?"

বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন—"তিনি ঘরে ছিলেন, কোথায় যেন চ'লে গেছেন।"

শচীদেবী তাড়াতাড়ি প্রদীপটি জ্বেলে দরজা খুললেন; বাইরে এসেই 'নিমাই' 'নিমাই' ব'লে ডাকলেন, কিন্তু কোন উত্তর নেই। তখন তিনি প্রদীপ হাতে ক'রে রাজপথ দিয়ে ডাকতে ডাকতে চ'লেছেন, সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে কোন উত্তর আর এল না।

শচীদেবী ফিরে এসে ঘরের দরজায় দাঁড়াতেই ধপাস ক'রে ব'সে পড়লেন, বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁকে ধ'রে বসালেন।

শচীদেবীর মর্ম্মান্তিক ডাকে ও পাঁজরভাঙা আর্ত্তনাদে দলে দলে লোক ছুটে আসতে লাগল। চারদিকে ভক্তদের মধ্যে এ সংবাদ বিদ্যুতের মত দ্রুত প্রচারিত হ'ল। তাঁরা অত্যন্ত দ্রুত ছুটে এলেন। নিত্যানন্দ, শ্রীবাস ও আরও অনেকে এলেন। এসে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন—"ব্যাপার কি ?"

নিত্যানন্দের দিকে চেয়ে শচীদেবী বললেন—"বৌমার ডাকে চমকে উঠে বেরিয়ে গিয়ে দেখি দরজা খোলা, নিমাই আমার নেই। ডাকতে ডাকতে ছুটে গেলুম, কিন্তু বেশী দূর ত যেতে পারলুম না, বৌমাকে কার কাছে রেখে যা'ব ? নিমাই নিশ্চয়ই আমায় ফেলে চ'লে গেছে। তোমাদের কথা সে শোনে। যেখানে তাকে পাও সেখান থেকে তাকে এনে দাও।"

শোকের আবেগে শচীদেবীর কথা বন্ধ হ'ল। হাজার হাজার নরনারীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সকলের হাহাকারে নদীয়ার আকাশ মুখর হ'ল।

এটা বুঝতে কারও বাকী রইল না যে, নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যেই গৃহত্যাগ ক'রেছেন। তাই ভক্তরা পরামর্শ করলেন যে, দু'চারজন ক'রে ভারতবর্ষের সব তীর্থস্থান খুঁজে দেখবেন, কোন না কোন তীর্থস্থানে তাঁকে পাওয়া যাবেই।

নিত্যানন্দ বললেন—"আমার একটা কথা আজ মনে পড়ছে। নিমাই একদিন ব'লেছিলেন কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নেবেন। তিনি হয়তো সেখানেই গেছেন। অন্য কোন খানে যাওয়ার

আগে কাটোয়ায় গিয়ে দেখা ভাল। আমি যা'ব, আর আমার সঙ্গে জনকয়েক মাত্র নেব। কোন রকমে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে হবে।"

নিত্যানন্দ ও বাছা বাছা অপর চারজন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। সকলে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে রক্ষা করবার জন্য রইলেন; কারণ, অবসর পেলেই তাঁরা হয়তো গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে সকল জ্বালার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করবেন।

নিত্যানন্দ এসে শচীদেবীকে বললেন—"মা, আপনি একটু শান্ত হোন, আমরা নিমাইকে খুঁজতেই চললুম। যেখানেই হোক তাঁকে 'বই, আর আপনার সঙ্গে তাঁর মিলনও ঘটা'ব। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।"

পাঁচজন আর ক্ষণকালও বিলম্ব না ক'রে ছুটলেন সোজা কাটোয়ার দিকে।

ভারতীর আশ্রমে

গঙ্গাতীরে বটগাছের তলায় কেশব ভারতী ধ্যানস্থ।

এদিকে নিমাই গঙ্গাপার হ'য়ে ভিজে কাপড়েই ছুটতে ছুটতে চ'লেছেন। এমনি ক'রে এসে কেশব ভারতীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

তাঁর রূপ আর তাঁর দেহের একটা অদ্ভুত তেজ দেখে ভারতী বিস্মিত হ'লেন। নিমাই ত তখন মাত্র চব্বিশ বছরের তরুণ যুবক। ভারতী জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি কে?"

নিমাই উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে, আমার নাম নিমাই।"

—"আমার কাছে কি মনে ক'রে এসেছ?"

—"আপনার চরণ দর্শন করবার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল। আপনি আশা দিয়েছিলেন আমায় সন্ন্যাসী হওয়ার মন্তর দেবেন। আজ আমায় মন্তর দিয়ে উদ্ধার করুন।"

নিমাইয়ের সঙ্গে যে দেখা হ'য়েছিল সে কথা ভারতীর মনে পড়ল। তিনি বললেন—"এখন উঠে বস, বিশ্রাম কর, তারপর কথা হবে'খন।"

এদিকে নিতাই প্রভৃতি পাঁচজন ঠিক তখনই সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। তাঁদের দেখেই নিমাই বললেন—"তোমরা এসেছ, খুব ভাল হ'য়েছে। আমি সন্ন্যাস নিয়ে বৃন্দাবন যা'ব।"

ভারতী গম্ভীর গলায় বললেন—"নিমাই, আমি তোমায় মন্তর দিতে পারব না, অন্য কোনখানে যাও।"

নিমাই বললেন—"আপনি আমায় কথা দিয়েছিলেন।"

ভারতী উত্তর করলেন—"কথা রক্ষা করতে ত আমি প্রস্তুত; কিন্তু তার ত একটা সময় আছে। পঞ্চাশ বছর না হ'লে সন্ন্যাস দেয়া কর্ত্তব্য নয়।"

—"তবে যাদের আয়ু পঞ্চাশের ঢের কম তাদের উপায় কি? আমি বড়ই কষ্ট পাচ্ছি, দয়া ক'রে আমায় উদ্ধার করুন।"

—"তোমার মা আছেন, স্ত্রী আছেন, সন্তান হয় নি; সুতরাং আমি তোমায় মন্তর দিতে পারব না। যেখানে ইচ্ছা সেখানে গিয়ে মন্তর নাও।"

—"আর আমাকে পরীক্ষা করবেন না ঠাকুর। মা ও স্ত্রীর অনুমতি নিয়েই চ'লে এসেছি। এখন আপনি দয়া করলেই হয়।"

এদিকে ক্রমে ক্রমে গঙ্গার তীরে বহু লোক জমে গেছে। কথাবার্ত্তা শুনে তা'রা সবই বুঝতে পারলে, এমন অপূর্ব্ব সুন্দর তরুণ যুবক মা ও স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হবেন ব'লে তাদেরও বড়ই দুঃখ হ'ল। অনেকেরই চোখ জলে ভ'রে গেল।

ভারতী বললেন—"এই দেখ এই যে হাজার হাজার লোক, এরা তোমায় চেনে না, তোমার সন্ন্যাসের কথায় কেঁদে ফেলেছে। এখন ভেবে দেখ দেখি তোমার মায়ের ও বালিকা পত্নীর অবস্থা।"

নিমাই বললেন—"তাঁরা আমায় অনুমতি দিয়েছেন।"

ভারতী বললেন—"তাঁরা অনুমতি দিয়েছেন? বল কি! খুব সম্ভব তাঁরা জানেন না সন্ন্যাস জিনিষটা কি? সন্ন্যাস আশ্রমে যে কী কষ্ট তাঁরা জানবেনই বা কি ক'রে? এ বয়সে সন্ন্যাসী ক'রে দিলে আমি তোমার মা ও পত্নী বধের ভাগী হ'ব। ও হয় না নিমাই।"

নিমাই অস্থির হ'য়ে বললেন—"ঠাকুর, আর পরীক্ষা করবেন না, আমায় বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিন, কৃষ্ণকে খুঁজতে বেরিয়েছি, আমার প্রাণ যে যায়। অহরহ তাঁর ডাক শুনছি। তিনি আমায় ডাকছেন, আমি থাকি কী ক'রে?"

ব'লেই নিমাই দু' হাত তুলে নাচতে সুরু করলেন। নদীয়া থেকে নিত্যানন্দ প্রভৃতি যে সব ভক্ত এসেছিলেন, তাঁরাও নেচে নেচে কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। কীর্ত্তনের এমনই এক মাদকতা আছে যে, মন দোল খায়। কাটোয়ার হাজার হাজার নরনারী সেই কীর্ত্তনে যোগ দিল, হরিধ্বনিতে সেখানকার আকাশ-বাতাস পূর্ণ হ'য়ে গেল।

সারা দিনই এই ভাবে চলল। ভারতী ভাবলেন, নিমাইকে বাধা দেয়া অসম্ভব। যিনি মায়ের অনুমতি পেয়েছেন, স্ত্রীকেও রাজী করিয়েছেন, তিনি কোন বাধাই মানবেন না। সুতরাং মন্ত্র দেয়াই ভাল।

তাঁকে ডেকে ভারতী বললেন—"নিমাই, তোমায় মন্তর দেবো স্থির ক'রেছি।"

নিমাই আনন্দে আত্মহারা। সন্ন্যাস নেয়ার আগের দিন সারারাত্রি কীর্ত্তন চলল। নানাদিক থেকে হাজার হাজার লোক খবর পেয়ে দেখতে এল। দেখতে দেখতে তা'রা দলে মিশে গিয়ে কীর্ত্তনে মত্ত হ'য়ে নাচতে লাগল। কাটোয়া-বাসীদের চোখে ঘুম নেই। নদীয়ারই মত কাটোয়া তখন টলমল। সকলেই মত্ত হচ্ছে, আত্মহারা হ'য়ে পড়ছে, নাচ আপনা-আপনি আসছে; কিন্তু কেন, তা কেউ বলতে পারে না।

নিমাই সন্ন্যাস নেবেন এইটি মনে ক'রে এই অসংখ্য জনগণও অশ্রু সংবরণ করতে পারলে না। এদিকে নিমাই এক একবার অচেতন হ'য়ে পড়ছেন, আবার চেতনালাভ কচ্ছেন। যেমনি চেতনা পাচ্ছেন, অমনি বলে উঠছেন—"আর কত দেরী?"

রাত কেটে গেল। সন্ন্যাসের ব্যবস্থা হ'ল। প্রথমেই মস্তক মুণ্ডন। নিমাইয়ের অনুপম, ভ্রমরকৃষ্ণ, কুঞ্চিত, লম্বমান কেশরাশি দেখে নাপিত মস্তক মুণ্ডনে আপত্তি জানালেন।

নিমাই বললেন,—"মাথা কামানো সন্ন্যাসের নিয়ম, না হ'লে হয় না।"

নাপিত বললেন—"না হ'লেই ত ভাল। আমি অনেক মাথা নেড়া ক'রেছি, কিন্তু এমন সুন্দর চুল কারও দেখি নি, আমি কামাতে পারব না ; যদি আর কেউ পারে তার কাছে যাও, ঠাকুর।"

নিমাই বললেন—"দেরী ক'রো না, তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা। আমার বুক যেন ফেটে যাচ্ছে, যত দেরী হচ্ছে আমার কষ্টও ততই অসহ্য হচ্ছে। তুমি ত কৃষ্ণভক্ত, আমি কৃষ্ণেরই অন্বেষণে যাচ্ছি। দয়া ক'রে আমায় খালাস ক'রে দাও।"

তাঁর দু চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়ছে দেখে নাপিতও স্থির থাকতে পারলেন না, মস্তক মুণ্ডনে রাজী হ'লেন। কিন্তু ক্ষুর ধরতেই তাঁর হাত গেল কেঁপে, চোখেও ঝাপসা দেখতে লাগলেন। এবার বন্ধন মোচন হবে, এই আনন্দে অধীর হ'য়ে নাপিতকে নিমাই বললেন—"এস একবার নেচে নি।"

নাপিতের সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে তিনি খানিকক্ষণ নৃত্য করলেন। তারপর মস্তক মুণ্ডন করা হ'ল।

নিমাই এবার চললেন গঙ্গাস্নানে, সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার লোক হরিনাম হরিধ্বনি কচ্ছে।

নাপিত ভাবলেন যে ক্ষুর দিয়ে এমন মহাপুরুষের মস্তক মুণ্ডন ক'রেছি, সে ক্ষুর দিয়ে আর ক্ষৌরকার্য্য করব না ; ক্ষৌরকার্য্যই এই শেষ। তিনিও হরিনাম করতে করতে নাচতে নাচতে ছুটলেন গঙ্গায়। গঙ্গায় নেমে তাঁর ক্ষুর, কাঁচি যা কিছু ছিল সবই ছুঁড়ে ফেললেন। সেই থেকে সমস্ত বিষয়-কর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে তিনি হরিনামেই মত্ত হ'য়ে রইলেন।

ভারতীর আশ্রমে

এদিকে নিমাই গঙ্গায় ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়েই কেশব ভারতীর কাছে গিয়ে করজোড়ে দাঁড়ালেন। চারদিকে হাজার হাজার লোকও ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ দেখছেন।

ভারতীর হাতে তিন খণ্ড অরুণ বস্ত্র। একখানি কৌপীন আর দুখানি বহির্ব্বাস। নিমাই অঞ্জলি ক'রে সেই বস্ত্র গ্রহণ করলেন, তারপর সকলকে উদ্দেশ ক'রে বললেন—"তোমরা সকলেই আমার সুহৃদ, বাবা, মা। এখন আমায় অনুমতি দাও আমি যেন ভবসাগর পার হই, শ্রীকৃষ্ণকে যেন পাই।"

অনুমতি আর কেউ দিতে পারলে না। চারদিকে কান্নার রোল উঠল।

এবার তাঁর কানে মন্ত্র দেয়ার সময়। ভারতীকে তিনি চুপি চুপি বললেন—"এক ব্রাহ্মণ স্বপ্নে আমাকে একটি মন্ত্র দিয়েছেন, আপনি আমাকে সেই মন্ত্র দেবেন কি অন্য কোন মন্ত্র দেবেন বিবেচনা করুন।"

তিনি মন্ত্রটি ভারতীকে বললেন। ভারতী খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হ'য়ে বললেন—"সন্ন্যাসের মহামন্ত্র ত এই-ই। এই মন্ত্রই আমি তোমার কানে দেবো।"

কানে মন্ত্র দিয়ে আর বুকে হাত দিয়ে কেশব ভারতী বললেন—"নিমাই, তুমি জীবকে শ্রীকৃষ্ণে চৈতন্য দিলে, তাই তোমার নাম হ'ল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"

অজানার সন্ধানে

নিমাই প্রবল বেগে দৌড় দিলেন বৃন্দাবনের দিকে। ইচ্ছা যে এক নিঃশ্বাসেই সেখানে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ধরেন।

চারদিকে লক্ষ লোকের ভীড়। সে ভীড় ভেদ ক'রে যাবেন কি ক'রে? কিন্তু যাওয়া ত চাই-ই, আর যে এক মুহূর্ত্তও থাকতে পাচ্ছেন না। ভীড়ে বাধা পেয়েছেন দেখে কেশব ভারতী ডেকে বললেন —"কৃষ্ণচৈতন্য, দাঁড়াও, তোমার দণ্ড আর কমণ্ডলু নিয়ে যাও।"

নিমাই ফিরে এসে দণ্ড আর কমণ্ডলু নিলেন।

ভারতী বললেন—"তোমাকে ছাড়া আমি আর থাকতে পাচ্ছি না। তুমি যদি অনুমতি কর, আমি তোমার সঙ্গে যা'ব।"

—"যে আজ্ঞে।"

আবার ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিলেন পশ্চিমদিকে। নিত্যানন্দ, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণও ছুটলেন আর ছুটল লাখখানেক মানুষ। তা'রা থাকতে পাচ্ছে না, কে যেন তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বহু ভক্ত কাটোয়াতেই অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে রইলেন। নিমাইয়ের দীর্ঘ সবল দেহ। দৌড়ে কেউ তাঁর সঙ্গে পেরে উঠছে না।

কাটোয়ার পশ্চিমে বিশাল বন। দৌড়ে দৌড়ে নিমাই গিয়ে ঢুকলেন সেই বনের মধ্যে। যারা পেছিয়ে প'ড়েছিল তা'রা আর বনে ঢুকতে পারলে না, তবু বহু লোক ঢুকল। নিত্যানন্দ প্রভৃতি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রইলেন। এই যে অগণিত লোক পেছনে ছুটে আসছে নিমাইয়ের কিন্তু সেদিকে কোন লক্ষ্যই নেই। তিনি অনন্ত পথের পথিক, চোখের সামনে শ্রীকৃষ্ণ, কানে তাঁরই বাঁশীর সুর, মুখে বলছেন —"যাচ্ছি প্রভু, যাচ্ছি।"

কাঁটার ঘায়ে পা কেটেছে, রক্ত পড়ছে, তিনি টেরও পাচ্ছেন না। মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ছেন। ভক্তরা সেই অবসরে তাঁর কাছে পৌঁছাচ্ছেন।

খানিক পরে মূর্চ্ছা ভেঙে যায়, ভক্তরা তাঁকে ঘিরে ব'সে থাকেন। তাঁদের দিকে তাঁর লক্ষ্য নেই। আবার উঠেই পশ্চিমদিকে দৌড়। ক্লান্তির লেশ মাত্র নেই, মুখে আনন্দের জ্যোতি, চোখে জল। ভক্তরা অবসন্ন হ'য়ে পড়েন। এমনি ক'রে দিন কেটে গেল।

সন্ধ্যা হয় হয়। নিমাই এমন জোরে দৌড় দিলেন যে, কেউ আর তাঁকে দেখতে পেলেন না। সন্ধ্যা হ'ল, অন্ধকার বন ঢেকে ফেললে। এখন উপায়? ভক্তরা একেবারে দ'মে গেলেন। কোন উপায় নেই। খানিকটা গিয়ে তাঁরা একটা গ্রাম দেখতে পেলেন। গ্রামে ঢুকে বাড়ী বাড়ী খোঁজ করলেন, কোথাও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। কী করা যায়? সমস্ত রাত্রি তাঁরা এক জায়গায় ব'সে রইলেন, খাওয়া ও ঘুমানো ত ভুলেই গেলেন।

রাত্রি প্রায় শেষ। চারদিক নিস্তব্ধ, নিথর। হঠাৎ দূর থেকে কান্নার শব্দ এল। তাঁরা উঠে শব্দ লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে যেতে লাগলেন। কান্না এত করুণ যে তাঁদের চোখেও জল আসছে। কাছে গিয়ে দেখলেন সম্পূর্ণ আত্মহারা নিমাই কেঁদে কেঁদে বলছেন,—"কৃষ্ণ, আমায় কি দেখা দেবে না? আর যে সইতে পারি না। একবার, একবার, শুধু একটিবার দেখা দাও।"

একটু পরেই নিমাই উঠে আবার পশ্চিমদিকে ছুটলেন। ভক্তদের দেখতেও পেলেন না। তখন না দেখছেন চোখে, না শুনছেন কানে, না আছে ক্ষিদে, আর না আছে তেষ্টা। অন্ধের মত টলছেন আর

ক্রমাগত চলছেন। পা ঠিক পড়ছে না, মাঝে মাঝে জ্ঞানহারা হ'য়ে প'ড়ে যাচ্ছেন ; নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ ধ'রে ফেলছেন।

তিন দিন তিন রাত্রি ক্রমাগত নিমাই চ'লেছেন। প্রথম দিন ত ছুটে ছিলেন। এর মধ্যে একবার একটু জলও স্পর্শ করেন নি। কাটোয়া থেকে প্রথম দিন পশ্চিমদিকে গিয়েছিলেন, তারপর চোখ বুজে বিহ্বল অবস্থায় চলতে চলতে উল্টো পথ ধরলেন। পশ্চিম-উত্তরে না গিয়ে যেতে লাগলেন পূর্ব্ব-দক্ষিণে। ভক্তরা সবই বুঝলেন, ভাবলেন যদি এমনি ক'রে শান্তিপুরের দিকেই নেওয়া যায়। হ'লও ঠিক তাই। তিন দিন পর দেখা গেল নিমাই শান্তিপুরের দু'চার ক্রোশের ভিতরেই এসে প'ড়েছেন।

শান্তিপুর থেকে হরিনাম তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মাঠে রাখাল বালকেরা সমস্বরে হরিনাম গান কচ্ছে। হরিনাম শুনে নিমাই থামলেন, কাছে গিয়ে তাদের বললেন—"বহুদিন হরিনাম শুনি নি বাবা, তোমরা আমায় বাঁচালে। বুঝেছি তোমরা ব্রজের রাখাল। বল ত বৃন্দাবনে যা'ব কোন পথে ?"

নিত্যানন্দ পেছনেই ছিলেন। তাঁরই ইঙ্গিতে রাখাল বালকগণ শান্তিপুরের পথ দেখিয়ে দিলে।

নিমাই এবার শান্তিপুরের পথই ধরলেন। নিত্যানন্দ তখুনি অদ্বৈতআচার্য্যের কাছে ব'লে পাঠালেন তিনি যেন নৌকা নিয়ে গঙ্গার তীরে অপেক্ষা করেন। এই খবর নিয়ে এক ভক্ত ছুটলেন তীরবেগে।

নিতাই প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে আছেন তা নিমাই কিছুই টের পাচ্ছেন না। যেতে যেতে অমনি এক একবার জিজ্ঞেস কচ্ছেন—"বৃন্দাবন আর কত দূর ?"

নিতাই পেছন থেকে জবাব দিচ্ছেন—"আর বেশী দূর নয়।" তাঁর গলা শুনেও নিমাই তাঁর দিকে তাকালেন না। নিতাই তখন তাড়াতাড়ি সামনে গিয়ে তাঁর পথ আটকে দাঁড়ালেন। নিমাই মুখ তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। নিতাই বললেন—"আমি নিত্যানন্দ।"

নিমাই তবু হা ক'রে চেয়েই রইলেন।

নিতাই বললেন—"আমায় চিনতে পাচ্ছেন না?"

নিমাই বললেন—"তোমায় যেন চিনি চিনি করি। নিত্যানন্দ?"

নিতাই। "আমি সেই অধম।"

নিমাই। "বল কি! তাই ত বটে! তুমি এখানে কি ক'রে এলে? আমি যে বৃন্দাবনে যাচ্ছি।"

নিতাই। "আপনি বৃন্দাবন যাচ্ছেন শুনেই ত ছুটে এসেছি। ছুটতে ছুটতে প্রাণ বেরিয়ে গেছে। এখন চলুন, যেতে যেতে সব বলব।"

নিমাই। "বেশ হ'য়েছে। দু'জনে একত্রে বৃন্দাবন যা'ব। আচ্ছা বল ত শ্রীকৃষ্ণ আমায় দর্শন দেবেন ত?"

নিতাই। "আগে বৃন্দাবনে ত যাওয়া যা'ক, তারপর দর্শন পাওয়ার জন্য পরামর্শ করা যাবে।"

খানিকটা চ'লেই নিমাই আবার জিজ্ঞেস করলেন—"বৃন্দাবন আর কতদূর?"

নিতাই। "বৃন্দাবন খুব কাছেই, এলাম ব'লে।"

নিমাই। "বল কি! কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।"

নিতাই। "বুঝতে আর কষ্ট কি? ঐ যে বটগাছ আর তার পাশে নদী।"

নিমাই। "তাতে কি হ'ল ?"

নিতাই। "ঐটি বৃন্দাবনের বংশীবট আর ঐ যে নদী, ঐটিই যমুনা।"

তাঁকে যে ফাঁকি দিয়ে শান্তিপুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা নিমাই বুঝতে পারলেন না। সেখান থেকেই মারলেন দৌড়। নিতাইও কাজেই দৌড় মারলেন। ছুটে গিয়েই গঙ্গাকে যমুনা মনে ক'রে নিমাই ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন।

ঠিক সেই সময়েই লোকজন সহ নৌকা নিয়ে অদ্বৈত সেখানে উপস্থিত হ'লেন।

নিমাই নেয়ে উঠলেন। অদ্বৈত একটি শুকনো কৌপীন হাতে দাঁড়িয়ে। অদ্বৈতকে দেখে তাঁর কী আনন্দ! বললেন—"তুমিও বৃন্দাবনে এসেছ অদ্বৈত? বেশ ক'রেছ। আচ্ছা বলত তুমি কি ক'রে জানলে আমি এখানে এসেছি ?"

অদ্বৈত চুপ। তাঁর দু' চোখ দিয়ে জল পড়ছে। নিমাইয়ের সন্দেহ হ'ল, জিজ্ঞেস করলেন—"এ কি তা হ'লে বৃন্দাবন নয় ?"

অদ্বৈত কিছুই বলতে পারলেন না। নিমাই এবার সব বুঝতে পেরে বললেন—"হায়রে যাঁর জন্যে সন্ন্যাস নিলুম তাঁকে আর পাওয়া হ'ল না! আমায় ভুলিয়ে নিয়ে এলে শান্তিপুরে! নিত্যানন্দ আমাকে ভাই বলে, ভাইয়ের খুব উপকার করলে যা হোক।"

অনেক বুঝিয়ে অদ্বৈত তাঁকে শান্ত ক'রে নৌকায় তুললেন। অদ্বৈত তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়ীতে।

এদিকে খবর পেয়ে নানাদিক থেকে হাজার হাজার লোক আসতে লাগল। লক্ষ কণ্ঠের হরিনাম কীর্ত্তনে শান্তিপুর টলমল।

অদ্বৈতের বাড়ী

আঙিনায় দাঁড়িয়ে নিত্যানন্দ ডাকলেন—"মা।"

"কে? নিতাই? আমার নিমাইকে এনেছ বাবা?"—ব'লেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন শচীদেবী।

নিতাই ফিরে এসেছেন, এ খবরটা চারদিকে মুহূর্ত্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, আর দলে দলে লোক চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে আসতে লাগল।

নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা শুনেই শচীদেবী অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন। খানিক পরে একটু চেতনা পেয়েই "নিমাই" "নিমাই" ব'লে ছুটলেন। সকলে তাঁকে ধ'রে এনে বসালেন।

নবদ্বীপের হাজার হাজার নরনারী চলল চার-পাঁচ ক্রোশ দূরে শান্তিপুরে নিমাইকে দেখতে। শত্রু-মিত্র, আপন-পর ভেদাভেদ রইল না, সকলেরই মন এত নরম হ'য়ে গেল।

আঙিনায় পাল্কী এল। শচীকে পাল্কীর কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তিনি পাল্কীতে ঢুকবেন, দেখলেন বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর আঁচল ধ'রে দাঁড়িয়ে। চারদিকে লোকারণ্য।

নিত্যানন্দ অতি সঙ্কোচের সহিত বললেন—"শ্রীমতীকে নিয়ে যেতে প্রভু বারণ ক'রেছেন।"

শচীদেবী বললেন—"তা হ'লে আমিও যা'ব না।"

আর দাঁড়াতে না পেরে শচীদেবী ব'সে পড়লেন। সমস্ত লোক স্তম্ভিত। একটু পরে তিনি বললেন—"আমায় বৌমার কাছে নিয়ে চল।" তাঁকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। ভিতরে গিয়েই তিনি বললেন—"যাবার উদ্যোগ ক'রে বড়ই অন্যায় ক'রেছি, আমি যা'ব না।"

বিষ্ণুপ্রিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হ'লেন, মাকে আস্তে আস্তে নানা কথা দিয়ে শান্ত করলেন। মায়ের প্রাণ এমনি যে, বিষ্ণুপ্রিয়ার কয়েকটি কথায়ই তিনি শান্তিপুর যেতে রাজী হ'লেন।

হরিনামের রোল উঠল। শচীদেবীকে নিয়ে সকলে শান্তিপুর রওনা হ'ল।

বিরাট কলরব ক'রে নদেবাসীরা শান্তিপুরে ঢুকল। চারদিকে এত যে পা ফেলা দায়। অদ্বৈতের আঙিনায় পাল্কী ঢুকতেই নিমাই ছুটে এসে শচীদেবীকে ধ'রে নামালেন এবং মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে প্রণাম করলেন। শচীদেবী ব'সে পড়লেন, নিমাই তাঁর সামনে বসলেন।

নিমাইয়ের গলা জড়িয়ে ধ'রে শচীদেবী বললেন—"নিমাই, তুমি যাই হও, আমি কিন্তু তোমাকে আমার দুধের ছেলেই মনে করি।"—ব'লেই নিমাইয়ের মুখে চুমো খেলেন।

বার বার প্রণাম ক'রে নিমাই বললেন—"মা, তোমার মত মা পাওয়ার চেয়ে বড় ভাগ্য আর নেই।"

শচীদেবী বললেন—"তাই বুঝি বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হ'য়ে আর আমায় দেখা দিলে না। তোমারই মুখ চেয়ে এতদিন র'য়েছি। তুমি যদি নিষ্ঠুর হও বাবা, তবে প্রাণে মরব।"

নিমাই বললেন—"তোমার ঋণ ত কোনদিন শোধ করতে পারব না মা, তোমায় ভুলব কি ক'রে? সন্ন্যাস নিলেও তোমায় কখনও ভুলব না।"

অদ্বৈত মা আর ছেলে দু'জনকেই ভিতরে নিয়ে গেলেন।

সেদিন নিমাইয়ের আহারের জন্য শচীদেবী নিজে রান্না করলেন।

নীলাচল যাত্রা

নিমাই অদ্বৈতকে বললেন—"কয়েকদিন ত কেটে গেল, আর ত থাকবার উপায় নেই। এক জায়গায় অনেক দিন থাকা সন্ন্যাসীর নিয়ম নয়।"

সকলেরই চোখে জল। এই কথাগুলো শচীদেবীর হৃৎপিণ্ডটা একেবারে মুচড়ে দিল।

অদ্বৈত জিজ্ঞেস করলেন—"কোথায় যাবেন এবার?"

নিমাই বললেন—"নীলাচলে যা'ব। মাকে রক্ষা করবার ভার তোমার ওপরে দিলুম।"

তারপর ভক্তদের ও সমবেত জনগণকে বললেন—"আমি কাউকেই ভুলব না। আবার আসব। তোমরা ঘরে ফিরে যাও, হরিনাম কর, হরিনাম শোনাও, জীবের দুর্গতি মোচনের চেষ্টা কর।"

কারো মুখ থেকে কথা বেরুল না, কেবল অদ্বৈত বললেন—"কয়েক-জন ভক্ত সঙ্গে যা'ক এই আমার অনুরোধ।"

নিমাই পাঁচজন ভক্ত সঙ্গে নিলেন। এই পাঁচ জনই সন্ন্যাসী। এঁদের নাম—নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, গোবিন্দ ও মুকুন্দ। এই পাঁচ জনকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার তীর দিয়ে নিমাই নীলাচল যাত্রা করলেন।

গঙ্গা যেখানে সাগরে মিশেছে সেখানটা তীর্থস্থান। প্রথমে এখানে এসে নিমাই বিশ্রাম করলেন। সেখানটাকে বলা হ'ত ছত্রভোগ।

সেখানকার রাজা রামচন্দ্র খান তরুণ সন্ন্যাসীর অদ্ভুত তেজ ও রূপ-লাবণ্য দর্শন ক'রে মুগ্ধ হন এবং তাঁর শিষ্য হ'য়ে হরিনাম প্রচার করতে থাকেন।

এমনি ক'রে হরিনাম করতে করতে ছয় সন্ন্যাসী চ'লেছেন। মাঝে মাঝে এক এক তীর্থস্থানে অবস্থান কচ্ছেন, আর সেখানে দলে দলে লোক এসে জুটছে, হরিনাম শুনে মুগ্ধ হচ্ছে, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে হরিনাম গাইতে গাইতে বিভোর হ'য়ে যাচ্ছে। এইভাবে বাংলাদেশ থেকে উড়িষ্যার সব জায়গায় হরিনামের প্রচার হ'তে লাগল। ক্রমে ক্রমে নিমাই পুরীতে উপস্থিত হ'লেন।

পুরীতে এসেই নিমাই এক দৌড়ে গিয়ে ঢুকলেন জগন্নাথের মন্দিরে। জগন্নাথকে কোলে নেবার জন্য তিনি এগিয়ে গেলেন; কিন্তু পারলেন না, মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গেলেন।

জগন্নাথের গায়ে হাত দেয়া! মন্দির-রক্ষকরা ছুটে এল নিমাইকে মারবার জন্য। ঠিক সেই সময়েই সেখানে উপস্থিত হ'লেন বাসুদেব সার্ব্বভৌম। নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে পেছনে ফেলেই নিমাই ছুটে এসেছিলেন; তাঁরাও এসে পড়লেন।

নিমাইকে নিয়ে তখন তাঁরা গেলেন বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বাড়ীতে। এই বাসুদেবই মিথিলা থেকে ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ ক'রে এসে বাংলাদেশে নব্য ন্যায়ের প্রবর্ত্তন করেন।

পুরীতে নিমাই ও তাঁর ভক্তগণের হরিনামে অনেকেই মুগ্ধ হ'ল। বাসুদেব মহাপণ্ডিত, শিষ্যদের বেদান্ত পড়ান; মনে মনে তাঁর খুব অহঙ্কার। বেদান্তের ব্যাখ্যা তাঁর মত আর কে করতে পারে? একদিন নিমাইয়ের ব্যাখ্যা শুনে এবং তাঁর অমানুষিক শক্তি ও

ভক্তিতে সার্ব্বভৌমও তাঁর বশ হ'লেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ হ'লেন।

সার্ব্বভৌমের মত অদ্বিতীয় পণ্ডিত নিমাই পণ্ডিতের শিষ্য হওয়ায় সারা উড়িষ্যায় হরিনাম খুব দ্রুত প্রচারিত হ'ল। উড়িষ্যার নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বান ডাকল।

নীলাচল * ত তখন হরিনামে টলমল।

* নীলগিরি। নীলগিরির প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত ব'লে জগন্নাথ-ক্ষেত্র বা পুরীকে নীলাচল বলা হয়।

দক্ষিণাপথে

ফাল্গুন মাস, পূর্ণিমা তিথি।

নিমাই ভক্তদের বললেন—"তোমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে কষ্ট হয়, তবু আমায় যেতেই হবে দক্ষিণাপথে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত, বিশ্বরূপের সন্ধানে। তোমরা আমায় অনুমতি দাও।"

আবার সেই বিচ্ছেদ। সকলেই কাতর হ'লেন। নিত্যানন্দ বললেন—"প্রভু, আপনার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে এমন কেউ নেই, তবু বলি একাকী যাবেন না। দাক্ষিণাপথের পথঘাট আমি সবই জানি, আমাকে সঙ্গে নিতে পারেন, না হয়, আর কাকেও নিন।"

নিমাই বললেন—"তুমি আমায় একবার ঠকিয়েছ ; যা'ব বৃন্দাবনে, তুমি নিয়ে গেলে শান্তিপুরে। তোমাকে আর সঙ্গে নিচ্ছি না। তোমরা এই নীলাচলেই থাক। আমি একবার ঘুরে এসেই তোমাদের সঙ্গে দেখা করব।"

নিতাই বললেন—"আমাকে না হয় না-ই নিলেন। কৃষ্ণদাসকে নিতে পারেন। ভারি সরল এই কৃষ্ণদাস, আপনার কোন কাজে সে বাধা দেবে না।"

নিমাই রাজী হ'লেন এবং কৃষ্ণদাসকে নিয়েই দক্ষিণাপথে যাত্রা করলেন। ক্রমে চিল্কা হ্রদ অতিক্রম ক'রে দুই পাশের মন্দির দর্শন করতে করতে চললেন। তার পর গোদাবরী পার হ'য়ে হরিনাম কীর্ত্তন করতে লাগলেন।

এই সময়ে রাজা রামানন্দ রায় দোলায় চ'ড়ে স্নান করতে এলেন। তাঁর সঙ্গে বহু ব্রাহ্মণ। স্নান ক'রে উঠে নিমাইকে দেখেই তিনি বিস্মিত হ'লেন, এবং আস্তে আস্তে এসে নিমাইকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। নিমাই তাড়াতাড়ি উঠেই বললেন—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল। তুমি কে?"

রামানন্দ উত্তর দিলেন—"প্রভু, আমি শূদ্রাধম রামানন্দ রায়।"

"ভগবানের নাম যে করে সে আবার শূদ্র কি? সবই যে সমান,"—ব'লেই নিমাই তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করলেন।

রামানন্দর শাস্ত্র-জ্ঞান ও ভক্তি গভীর। একে একে নয় দিন এক সঙ্গে থেকে নিমাই তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে সেতুবন্ধ যাত্রা করলেন।

দক্ষিণ ভারতেও নিমাইয়ের প্রেমধর্ম্ম বিস্তার লাভ করল। তিনি হরিনাম বিলিয়েই চ'লেছেন, যে শুনছে আর যে তাঁকে দেখছে সেই মুগ্ধ হচ্ছে, তাঁর শিষ্য হ'য়ে কৃতার্থ হচ্ছে। দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধগণ প্রথমটা যথেষ্ট বিরোধিতা ক'রেছিল, কিন্তু শেষে নিমাইয়েরই প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম তা'রা গ্রহণ করে।

উড়িষ্যার মত দক্ষিণাপথও হরিনামে পূর্ণ হ'ল। নিমাই যেখানে অবস্থান করেন সেখানেই ক্রমে ক্রমে হাজার হাজার লোকের ভীড় হয়, আর তা'রা হরিনামে মত্ত হ'য়ে নৃত্য করে। আচণ্ডালে সমান প্রেম দিচ্ছেন, সকলকেই তিনি কোল দিয়ে ধন্য কচ্ছেন।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের এক দেবালয়ে এক ব্রাহ্মণ রোজ গীতা পাঠ করেন। সংস্কৃত জানেন না, কাজেই উচ্চারণে ভুল হয়। শিক্ষিত লোক হাসে আর ঠাট্টা করে। ব্রাহ্মণের সেদিকে খেয়াল নেই, একমনে পাঠ করেন।

একদিন নিমাই তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—"ঠাকুর, গীতার ত অনেক রকম ব্যাখ্যা হয়, আপনার কোন্ ব্যাখ্যা সব চেয়ে ভাল লাগে ?"

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন—"আমি মহামূর্খ, গীতার অর্থ কিছুই বুঝি না। যখনই পড়ি তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন এই চিত্রটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এতেই আমি আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে যাই।"

নিমাই বললেন—"আপনিই গীতাপাঠের অধিকারী, গীতা আপনিই বুঝেছেন।"

ব্রাহ্মণকে তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে তিনি আলিঙ্গন করলেন। ব্রাহ্মণ তাঁর শিষ্য হ'ল।

এই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে (বর্ত্তমান শ্রীরঙ্গপত্তন) নিমাই চার মাস বেঙ্কট ভট্ট নামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করেন। এই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সেখানকার অন্যান্য সকলেই নিমাইয়ের ধর্ম্ম অবলম্বন করে।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত দক্ষিণাপথের সকল তীর্থ ও মন্দির দর্শন ক'রে এবং তাঁর প্রেমধর্ম্ম দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের চিত্ত জয় ক'রে তিনি ফিরলেন। ফেরবার পথে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে আবার দেখা হ'ল।

রামানন্দ বললেন—"প্রভু, রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুমতি নিয়ে রাজকার্য্য থেকে অবসর নিয়েছি। নীলাচলে গিয়েই বাস করব স্থির ক'রেছি। আপনি এগিয়ে চলুন।"

নীলাচলে

নীলাচলে ফিরে এসে নিমাই রইলেন কাশীমিশ্রের বাড়ীতে। এদিকে কৃষ্ণদাস সেখান থেকে গেলেন নবদ্বীপে শচীমাতাকে খবর দিতে। নিমাইয়ের খবরে শচীমাতাই শুধু আনন্দিত হ'লেন না, নদীয়া ও শান্তিপুরের হাজার হাজার ভক্তেরও আনন্দের সীমা রইল না। অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস, দামোদর, মুরারি, মুকুন্দ প্রভৃতি বহু ভক্ত নীলাচল যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। সে এক বিরাট দল।

গুরু কেশব ভারতীও নীলাচলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁর কাছেই অবস্থান করলেন। এই সময়েই উড়িষ্যার প্রতাপশালী রাজা প্রতাপরুদ্র দীনহীন বেশে নিমাইয়ের কৃপাভিক্ষা করেন এবং তাঁর কৃপালাভ ক'রে ধন্য হন। স্বয়ং রাজা যাঁর শিষ্য দেশশুদ্ধই তাঁর বশ। নিমাই তখন দিগ্বিজয়ী।

এদিকে নদীয়া ও শান্তিপুর থেকে দু'শো ভক্ত কীর্ত্তন করতে করতে পুরীতে উপস্থিত হ'লেন। তাঁদের পেয়ে নিমাই বড়ই আনন্দিত হ'লেন। রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁদের সেবার ভার নিলেন। তখন জগন্নাথের রথযাত্রার সময়। নিমাই তাঁর পূর্ব্বপরিচিত বাঙালী ও উড়িষ্যার নতুন ভক্তদের সঙ্গে কীর্ত্তনে বিভোর হ'লেন। রথ চ'লেছে, সামনে নিমাই নৃত্য করতে করতে চ'লেছেন; চারদিকে খোল ও করতালের সাথে লক্ষকণ্ঠে হরিনাম গান হচ্ছে। সে অপূর্ব্ব দৃশ্যে লক্ষ লক্ষ নরনারী তন্ময়।

চারমাস কেটে গেল নিমাই বাংলার ভক্তদের বিদায় দিলেন; ব'লে দিলেন—"তোমরা দেশে ফিরে গিয়ে আচণ্ডালে প্রেম দেবে। রথের সময়ে আবার এস, রথ শেষ হ'লেই চ'লে যেও, এবারকার মত এত বেশী দিন এখানে আর থেকো না।"

পরের বছরও বাংলাদেশের ভক্তগণ এলেন এবং পূরো চারমাস কীর্ত্তন ক'রে কাটালেন। সন্ন্যাসের পর ছ' বছর নিমাই দক্ষিণদেশ ভ্রমণ ক'রেছেন আর ছ'বছর নীলাচলেই ভক্তদের সঙ্গে কেটে গেল। এবার তিনি বাধ্য হ'য়ে নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তদের ব'লে দিলেন—"আমি বহুদিন থেকেই বৃন্দাবনে যাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে আছি, তোমাদের জন্য যাওয়া হচ্ছে না, এখানে না এসে দেশে গিয়ে ধর্ম্ম কর; সে ধর্ম্ম হচ্ছে 'জীবে দয়া, নামে রুচি, ভক্তি ভগবানে'। জীবকে হরিনাম শোনাও, সকলের পাপ তাপ দূর হ'য়ে যা'ক।"

আবার গৌড়ে

ভক্তদের নিয়ে নিমাই বাংলাদেশের দিকে যাত্রা করলেন। উড়িষ্যার অগণিত ভক্তদের ক্রমে ক্রমে বিদায় দিলেন, শুধু বাঙালী ভক্তরাই সঙ্গে রইল। কিন্তু নিমাই আসছেন জেনে এক এক জায়গায় লাখ লাখ লোক জড় হ'ল। ভক্তদের কীর্ত্তনে সারাপথেই নানা দিক থেকে দলে দলে লোক ঝাঁপিয়ে আসতে লাগল।

দক্ষিণ-ভারত জয় ক'রে এমনিভাবে চ'লে চ'লে নিমাই এসে কুলিয়া গ্রামে উপস্থিত হ'লেন। সেখানে অসম্ভব রকমের ভীড় হ'য়েছিল। শুধু তাঁর দর্শন লাভ করার জন্যই ব্যাকুল জনগণ নৌকায় গঙ্গাপার হওয়ার বিলম্ব সইতে না পেরে, সাঁতার কেটে গঙ্গার ওপারে গিয়েছিল। এই কুলিয়া থেকে তিনি গেলেন শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে। এখানে তিনি কয়েকদিন রইলেন। এই সময়েই শচীদেবী আগের বারের মত শান্তিপুরে গিয়ে নিমাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। শচীদেবী যেতেই নিমাই ছুটে এসে তাঁর চরণ বন্দনা করলেন।

কয়েকদিন পরেই মায়ের অনুমতি নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন মথুরায়। এবার হাজারেরও বেশী লোক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলল। তিনি যতই এগিয়ে যেতে লাগলেন লোকের ভীড়ও ততই বাড়তে লাগল। হাজার হাজার কণ্ঠের হরিধ্বনিতে পথের দু' পাশের গাঁয়ের লোক গাঁ ছেড়ে ছুটে এল। এমনি ক'রে তিনি গৌড় নগরের সন্নিকট রামকেলিতে আগমন করেন।

তখন গৌড়ের নবাব হুসেন সাহ। নবাবের প্রধান মন্ত্রী সনাতন আর সনাতনের সহকারী তাঁরই ছোট ভাই রূপ। সারা রাজ্যে সনাতন ও রূপের প্রবল প্রতাপ। ব্রাহ্মণ হ'য়েও তাঁদের চাল-চলন ছিল মুসলমানের মত, পারসী লিখতে ও পড়তে তাঁরা ছিলেন অসাধারণ। সনাতনের কথা ছাড়া নবাব কিছুই করতেন না। এদিকে সংস্কৃত শাস্ত্রেও এঁদের পাণ্ডিত্য ছিল খুব বেশী। অবসর পেলেই বড় বড় পণ্ডিত আনিয়ে শাস্ত্রচর্চ্চায় তন্ময় হ'তেন। নিমাই পণ্ডিতের কথা প্রায়ই শোনেন আর আলোচনা করেন, কিন্তু তখনও তাঁর দর্শন লাভ হয় নি।

সনাতনের স্বপ্ন

ভোরে উঠেই রূপকে ডেকে সনাতন বললেন—"দেখ, কাল রাত্তিরে স্বপ্নে দেখলুম এক ভারি সুন্দর কাঁচা বয়সের সন্ন্যাসী আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন—'সনাতন, আর দেরী ক'রো না, ভগবানের সেবায় মনপ্রাণ দাও, লুপ্ততীর্থের উদ্ধার কর, আর ভক্তিশাস্ত্র প্রচার কর।'"

রূপ বললেন—"মনে হয় স্বপ্নে আপনি নদীয়ার নিমাইকে দেখেছেন। এ তাঁরই উপদেশ। আমরা পতিত, বিষয়-কর্ম্ম নিয়েই ত জীবন কাটালুম, মানুষ ত সত্যিই হই নি।"

সনাতন ও রূপ খুব গম্ভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন, তারপর নিমাইয়ের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় পরামর্শ ক'রে তাঁর কাছে চিঠি লিখলেন। কিছুদিন পরেই বৃন্দাবনের পথে নিমাই রামকেলিতে আগমন করলেন।

নবাবের কাছে কোতোয়াল গিয়ে বললে—"জাঁহাপনা, রামকেলিতে এক হিন্দু সন্ন্যাসী এসেছেন, সঙ্গে অসংখ্য লোক। রাজদ্রোহের আশঙ্কা আছে মনে হয়।"

নবাব জিজ্ঞেস করলেন—"সন্ন্যাসীটি কেমন? তাঁর আচার-ব্যবহারই বা কি রকমের?"

কোতোয়াল বললে—"সন্ন্যাসীটি অদ্ভুত, এমন সুন্দর মানুষ কখনও দেখি নি, একেবারে কাঁচা সোনার মত রং, মুখখানা আলোর মত উজ্জ্বল। অসংখ্য লোকের সঙ্গে হরিনাম কচ্ছেন আর নাচ্ছেন।"

নবাব তারে চ'লে যেতে ব'লে কেশব খান নামে এক কর্মচারীকে ডাকালেন। কেশব খান এসে সেলাম ক'রে দাঁড়াতেই নবাব জিজ্ঞেস করলেন—"কেশব, রামকেলিতে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী এসেছেন, সঙ্গে তাঁর অসংখ্য লোক, সকলেই তাঁর ভক্ত। তুমি তাঁর সম্বন্ধে কিছু জান কি ?"

কেশব বললেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ জাঁহাপনা, জানি। তিনি সামান্য একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মাত্র।"

নবাব বললেন—"কেশব, কেন তুমি একথা বললে বুঝতে পেরেছি। তিনি সামান্য সন্ন্যাসী নন। আমি ত শুধু গৌড়ের রাজা, তিনি জগতের রাজা। তোমরা আমার টাকা খেয়ে আমার আদেশ পালন কর, আর লক্ষ লক্ষ লোক ঘরের খেয়ে সব ভুলে রোদ্দুরে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে এই সন্ন্যাসীটির পেছনে ঘুরে বেড়ায় কেন ? একি সোজা কথা নাকি ? এ সন্ন্যাসী মানুষ নন, ইনিই তোমাদের দেবতা। কোতোয়ালকে ব'লে দাও যেন এই সন্ন্যাসীর কোনও কাজে কেউ বাধা না দেয়।"

"যে আজ্ঞে জাঁহাপনা"—ব'লে কেশব চ'লে গেলেন, কিন্তু রামকেলিতে সনাতনের কাছে খবর দিলেন নিমাই যেন রাজধানীর কাছে না থেকে অন্য জায়গায় যান।

গভীর রাত্রে সনাতন ও রূপ ছদ্মবেশে নিমাইকে দর্শন করতে গেলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাঁদের নিয়ে গেলেন নিমাইয়ের সামনে। দাঁতে কুটো নিয়ে দু'ভাই নিমাইয়ের পায়ের তলায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়লেন।

নিমাই তাঁদের তুলে বসালেন ; বললেন—"তোমাদের দেখবার

নিমাইয়ের সমীপে ছদ্মবেশে রূপ ও সনাতন [১৪৮ পৃষ্ঠা]

জন্তই আমার এই রামকেলিতে আসা। তোমাদের পেয়ে যে কী আনন্দ হ'য়েছে বলতে পারি না। আমি তোমাদের পা'বই, নইলে চলবে না। এখন তোমরা বাড়ী ফিরে যাও।"

রূপ ও সনাতন সকলের নিকট বিদায় নিলেন। যাওয়ার পূর্ব্বে ব'লে গেলেন—"প্রভু, তীর্থযাত্রায় এত লোক সঙ্গে নেয়া ভাল নয়, বৃন্দাবন যাওয়ার ত এ রীতি নয়। কাজেই এস্থান ত্যাগ ক'রে অন্ত স্থানে গমন করুন।"

সনাতন যাঁকে স্বপ্নে দেখেছিলেন তাঁকে এবার সত্যিই দর্শন করলেন।

নিমাই আবার শান্তিপুরে এলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত খবর পেয়েই শচীদেবীকে শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। মায়ের সঙ্গে ছেলের আর একবার মিলন হ'ল। শান্তিপুর লোকে লোকারণ্য হ'ল।

বেগম সাহেবার ক্রোধ

নবাব হুসেন সার পিঠে একটা লম্বা দাগ দেখে বেগম সাহেবা জিজ্ঞেস করলেন—"জনাব, আপনার পিঠে এ দাগ কিসের ?"

নবাব বললেন—"ও কিছু নয়, অমনি একটা দাগ।"

বেগম। "তা কি হয় জনাব ? নিশ্চয়ই কিছু একটা হ'য়েছিল।"

নবাব। "তা তোমার শুনে দরকার নেই। কবে কি হ'য়েছে না হ'য়েছে তা নিয়ে আর এখন কি হবে ?"

বেগম। "তা হোক বা না হোক, আমায় বলতেই হবে।"

নবাব। "শোন তা হ'লে। এই গৌড়ে সুবুদ্ধি রায় নামে আমারই অধীনে এক রাজা আছেন। আমি পূর্ব্বে তাঁরই অধীনে চাকরী করতুম। তিনি আমাকে একটি পুকুর কাটাবার ভার দেন। আমার ওপরে তাঁর সন্দেহ হ'ল যে আমি তাঁর টাকা আত্মসাৎ ক'রেছি। তারপর আমাকে ধ'রে নিয়ে আমার পিঠে চাবুক মারেন। এই যে দাগ দেখ্‌ছ এ সেই চাবুকেরই দাগ।"

বেগম সাহেবা রেগে লাল হ'য়ে বললেন—"জনাব, যে সুবুদ্ধি রায় আপনার পিঠে চাবুক মেরেছে, নবাব হ'য়েও আপনি তাকে জীবিত রেখেছেন ?"

নবাব বললেন—"তাঁরই বুদ্ধিবলে আর চক্রান্তেই ত সামান্য লোক হ'য়েও আজ নবাব হ'তে পেরেছি।"

বেগম। "তা যাই হোক, তাকে বধ করাই চাই।"

নবাব। "তিনি আমার মনীব ছিলেন, তাঁর ঢের নূন খেয়েছি। তবে তুমি যখন ধ'রেছ তখন এক কাজ করা যা'ক। এখানে ডেকে এনে তাঁর জাত মেরে দেয়া যাক। হিন্দু সমাজে এর চেয়ে বড় শাস্তি আর নেই।"

এ প্রস্তাবে বেগম সাহেবা রাজী হ'লেন।

এক দিন রাজবাড়ীতে ডেকে এনে সুবুদ্ধি রায়ের জাত মেরে দেওয়া হ'ল।

সুবুদ্ধি রায় হ'লেন পতিত। গৌড়ের সমাজে তিনি একঘ'রে। কত লোকের কাছে কত কাকতি মিনতিই না তিনি করলেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। পণ্ডিতেরা এক বাক্যে বললেন—"এ পাপে তুষানল করা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা শাস্ত্রে নেই।"

সুবুদ্ধি রায়ের সব বুদ্ধিই গেল লোপ পেয়ে। তুষের আগুনে ধিকি ধিকি পুড়ে প্রাণত্যাগ করা! কোন উপায় না দেখে বিষয়-সম্পত্তি ঘর-সংসার ছেড়ে তিনি চ'লে গেলেন কাশীতে; ভাবলেন কাশীর ভট্টাচার্য্যিরা আরও বেশী শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁরা যদি অন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু 'অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়।'

বারাণসীর পণ্ডিতেরাও ব্যবস্থা দিলেন "তপ্ত ঘৃত পানে প্রাণত্যাগ।"

বৃন্দাবনের পথে

শচীমাতার কাছে বৃন্দাবন যাওয়ার অনুমতি নিয়ে নিমাই ভক্তদের বললেন—"স্থির ক'রেছি নীলাচল হ'য়ে বৃন্দাবন যা'ব, এবার আর তোমরা কেউ নীলাচলে যেও না।"

পথে কোথাও বিলম্ব না ক'রে ক্রমাগত চ'লে চ'লে মাত্র কয়েকজন ভক্তের সহিত তিনি নীলাচলে এলেন। তিনি ফিরে এসেছেন জানতে পেরে উড়িষ্যার নানা স্থানের ভক্তগণ আসতে লাগলেন নীলাচলে। রাজা প্রতাপরুদ্রও স্বয়ং নীলাচলে এসে তাঁকে দর্শন ক'রে ধন্য হ'লেন।

বর্ষা কেটে গেল। শরৎকাল অপূর্ব্ব রূপ নিয়ে দেখা দিল। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণদাস নামে দুইটি ব্রাহ্মণ সঙ্গে নিয়ে নিমাই একদিন প্রত্যূষে বনপথে বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। তাঁকে দেখতে না পেয়ে ভক্তরা হাহাকার ক'রে উঠলেন।

এদিকে নির্জ্জন বনের ভিতর দিয়ে কৃষ্ণ নাম নিতে নিতে উন্মত্ত হ'য়ে নিমাই ছুটেছেন। পেছনে পেছনে ছুটেছেন বলভদ্র আর কৃষ্ণদাস।

বনে পালে পালে হিংস্র পশু। কোথাও বাঘ, কোথাও মহিষ, কোথাও হাতী, আর কোথাও বা গণ্ডার। নিমাইয়ের সেদিকে লক্ষ্য নেই, কোন ভয়ও নেই। কৃষ্ণনাম কচ্ছেন, চোখে কৃষ্ণের মন-ভোলানো শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি, আর কানে তাঁরই পাগল-করা বাঁশীর

স্বর। পথে বন দেখলেই তিনি মনে করেন বৃন্দাবন, পাহাড় দেখলেই মনে করেন গিরি-গোবর্দ্ধন, আর নদী দেখলেই মনে করেন যমুনা।

ক্রমে ক্রমে কত বন, কত প্রান্তর, কত নদী, কত পাহাড় পেছনে রেখে সামনে এগিয়ে গেলেন। বলভদ্র বনের ফলমূল শাক রান্না ক'রে তাঁর সেবা করেন। কখনো বা কোন গ্রামের লোকেরা বলভদ্রের দ্বারা রান্না করিয়ে তাঁকে ভোগ দেয়। এমনি ক'রে তিনি এসে উপস্থিত হ'লেন কাশীতে।

এবার কাশী টলমল ক'রে উঠল। সকলের মুখেই নিমাইয়ের কথা, সকলেই তাঁকে দর্শন করবার জন্য ছোটে, হরিনাম কীর্ত্তনে সকলেই নেচে ওঠে।

এই সময়ে কাশীধামের বহু বিখ্যাত পণ্ডিত নিমাইয়ের চরণে আত্মসমর্পণ করেন। নিমাইয়ের এই নূতন বৈষ্ণবধর্ম্ম, মুক্তির এই অভিনব আনন্দপূর্ণ পন্থা কোটি কোটি লোক গ্রহণ ক'রে ধন্য হ'ল।

এক দিন সুবুদ্ধি রায় এসে কাঁদতে কাঁদতে নিমাইয়ের পায়ে পড়লেন; বললেন—"প্রভু, আপনি ত কোটি কোটি জীবের উদ্ধার কচ্ছেন, কৃপা ক'রে আমায় উদ্ধার করুন। আমি পাপী, সমাজে আমার স্থান নেই। জোর ক'রে আমার জাত মেরে দেয়া হ'য়েছে। সকল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব'লেছেন তুষানলে প্রাণ ত্যাগ ছাড়া আর আমার কোনও উপায় নেই।"

নিমাই তাঁকে তুলে হেসে বললেন—"তুমি কোন পাপই কর নি, প্রায়শ্চিত্ত কিসের? জাত কি কারও মারা যায়? তুমি হরিনাম কর। হরিনাম নিলেই তুমি শুদ্ধ, পবিত্র। তোমায় আর কিছুই করতে হবে না।"

সুবুদ্ধি রায়ের অন্তরের সমস্ত অন্ধকার এক মুহূর্ত্তেই দূর হ'য়ে গেল, তিনি নতুন আনন্দে আত্মাহারা হ'য়ে হরিনাম সার করলেন।

কাশী থেকে নিমাই মথুরা যাত্রা করলেন। প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান ও বেণীমাধব দর্শন করলেন। তারপর পথে আর বিলম্ব না ক'রে গেলেন মথুরায়। মথুরার এক এক মন্দির দর্শন করেন আর আনন্দে নৃত্য করেন। লোক গিস্ গিস্ করে, সকলেই তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণনাম করে আর নাচে। এখানেও অগণিত লোক তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন।

তারপর বৃন্দাবনের চার ধারের বনে বনে তিনি বেড়াতে আরম্ভ করলেন। এক এক বার মূর্চ্ছিত হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে যান, আবার যখন সংজ্ঞা লাভ করেন অমনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ব'লে উন্মত্ত হ'য়ে পড়েন। প্রেমের আবেশে তাঁর মুখ থেকে হরিনাম বেরুচ্ছে, বনের হরিণ আর ময়ূরও যেন বিহ্বল হ'য়ে শুনছে, রাখাল ছেলেরা পেছনে পেছনে ছুটছে। গিরি-গোবর্দ্ধন দেখে এবং একখণ্ড পাথর জড়িয়ে ধ'রে তিনি সংজ্ঞা হারালেন। তার পর সংজ্ঞা লাভ ক'রে বহু মন্দির, পুণ্য-সরোবর ও সকল কুঞ্জবন একে একে দেখলেন।

যেখানেই নিমাই যান সেখানেই তাঁর দর্শনের জন্য লোকের ভীড় ক্রমাগতই বাড়ে। তিনি ফিরে এলেন মথুরায়, সেখানেও অগণিত লোকের ভীড়। কাজেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় আত্মগোপন করতে লাগলেন, কিন্তু কিছুতেই ভীড় কমাতে পারেন না। বৃন্দাবনে এক এক দিন এক এক কুণ্ডে বা কুঞ্জে গিয়ে কিংবা কোনও নিভৃত জায়গায় ব'সে আত্মহারা হ'য়ে কৃষ্ণনাম করতেন, সেখানেও জন-সমাগমের কিছুমাত্র অভাব হ'ল না।

একদিন বলভদ্র বললেন—"প্রভু, দিন দিন যে রকম লোকসংখ্যা বেড়ে চ'লেছে তাতে আর এখানে থাকা উচিত মনে করি না। আমার ইচ্ছা আপনাকে নিয়ে প্রয়াগে গিয়ে মকর স্নান করি।"

নিমাই বললেন—"তুমি আমাকে বৃন্দাবন দেখিয়েছ, তোমার কাছে আমি ঋণী। তুমি যা বলবে আমি শুনব, আমায় যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাও।"

বলভদ্র আর কৃষ্ণদাস ত ছিলেনই, আরও দু'জন ভক্ত এবার তাঁর সঙ্গ নিলেন। তিনি এই চারজন নিয়ে প্রয়াগতীর্থে যাত্রা করলেন।

পাঠান বৈরাগী

"ঐ যে আমার কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন, মরি মরি কী স্বর! বাঁশী বাজিয়েই ঐ যে ডাকছেন"—ব'লেই নিমাই মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন এক গাছতলায়।

এক রাখাল ছেলে বাজাচ্ছিল এক বাঁশের বাঁশী। নিমাইয়ের কানে গিয়েছিল সেই বাঁশীর স্বর। সেই স্বরই 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো'।

তিনি গাছতলায় প'ড়ে আছেন, শ্বাস বইছে কি না বইছে। ভক্ত চারজন ব'সে আছেন।

এমন সময়েই কয়েকজন অশ্বারোহী পাঠান সৈনিক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের সন্দেহ হ'ল। তা'রা ভাবলে যে ঐ চারজন দস্যু, ধনের লোভে সন্ন্যাসীর বেশধারী যুবককে হত্যা ক'রে গাছতলায় শুইয়ে রেখেছে। তা'রা তাড়াতাড়ি এসে ভক্ত ক'টিকে বাঁধলে। তাঁদের জিজ্ঞেস করলে—"তোরা এই সাধুকে খুন করলি কেন বল? জলদি বল, নইলে এখনই কেটে ফেলব।"

বলভদ্র ত থর থর ক'রে কাঁপছেন, কী আর বলবে। কৃষ্ণদাসের অবস্থাও তাই। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন খুব বুড়ো। বুড়োই সাহস ক'রে বললেন—"আমরা এই সন্ন্যাসীকে মারি নি। ইনি প্রায়ই এরকম অচেতন হ'য়ে পড়েন, আবার ভাল হন। আপনারা একটু অপেক্ষা ক'রেই দেখুন। ইনি আমাদের গুরু, শিষ্য কি গুরুকে কখনও মারতে পারে?"

ঠিক এই সময়েই নিমাই চৈতন্য লাভ করলেন এবং উঠে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ব'লে নাচতে সুরু করলেন।

একজন পাঠান সেনা তাঁকে জিজ্ঞেস করলে—"হ্যাঁ সন্ন্যাসী ঠাকুর, এরা কি টাকা-পয়সা চুরি করার জন্য তোমায় কিছু খাইয়ে অজ্ঞান ক'রে রেখেছিল ?"

নিমাই বললেন—"না, না। আমার এ রকম হয়, কেমন বিহ্বল হ'য়ে পড়ি। এরাই আমার রক্ষণাবেক্ষণ করে।"

ভক্তরা খালাস পেলেন।

সৈনিকদের মধ্যে একজন ছিলেন পণ্ডিত। জ্ঞানী ব'লে তাঁর একটু দেমাকও ছিল। তিনি নিমাইয়ের সঙ্গে ঈশ্বর ও ধর্ম্ম নিয়ে তর্ক জুড়ে দিলেন। নিমাই তাঁর সমস্ত যুক্তিই খণ্ডন করলেন।

সৈনিকপুরুষ এত মুগ্ধ হ'লেন যে, তিনি সৈনিকের কাজ ছেড়ে দিয়ে নিমাইয়ের সেবক হ'য়ে থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নিমাই তাঁকে কৃষ্ণ নাম বলতে বললেন এবং তাঁর নাম রাখলেন রামদাস। রামদাসকে তার পর থেকে সকলে বলত পাঠান বৈরাগী।

নিমাই কয়েক দিন পরে প্রয়াগতীর্থে আগমন করলেন। এখানেই রূপ গোস্বামীর সহিত তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

রূপের গৃহত্যাগ

তখনও রাত্রি শেষ হয় নি। ঝুপ ঝুপ ক'রে সমস্ত রাত মুষলধারে বৃষ্টি প'ড়েছে।

রূপ চ'লেছেন ভিজতে ভিজতে রাজবাড়ীতে। পথেই এক ধোপার বাড়ী। ধোপা আর ধোপানীর ঘুম ভেঙে গেছে। মানুষের পায়ের শব্দ শুনে ধোপা ধোপানীকে বললে—"ঐ যে পায়ের শব্দ শুনছি, চোর এল নাকি ?"

ধোপানী মুখ বেঁকিয়ে বললে—"আরে না, এ বিষ্টিতে বুঝি চোর বেরোয় ?"

ধোপা। "তা হ'লে বোধ হয় শেয়াল-কুকুর যাচ্ছে।"

ধোপানী। "তুমি ত ভারি বোকা দেখছি। শেয়াল-কুকুরও এমন জল ঝড়ে বেরোয় না। নিশ্চয়ই রাজবাড়ীর কোন চাকর যাচ্ছে। চাকর ছাড়া এ দুর্গতি আর কারও হয় ?"

এ কথাটা রূপের কানে গেল। সংসারের প্রতি একেই তিনি বিরক্ত হ'য়েছিলেন, তার ওপর ধোপানীর এই কথাগুলো তাঁর মনে একেবারে দাগ কেটে ব'সে গেল। রাজবাড়ী থেকে ফিরে এসেই তিনি স্থির করলেন আর চাকরী করবেন না, বিষয়-কাজে আর থাকবেন না ; আর রাজবাড়ীতে ফিরবেন না।

সংসারত্যাগের ইচ্ছা তিনি জ্যেষ্ঠ ভাই সনাতনকে জানালেন। সনাতন অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি টাকাকড়ি কতক আত্মীয়-স্বজনকে আর কতক অন্য লোককে দান করলেন।

তিনি না থাকলে পাছে সনাতনের কোন বিপদ ঘটে* এই আশঙ্কায় তিনি দশ হাজার টাকা একজন বিশ্বাসী বণিকের কাছে গচ্ছিত রাখলেন। দু' ভাই একসঙ্গে রাজ-সরকারের সম্পর্ক ত্যাগ করলে নবাব চ'টে গিয়ে কি যে করবেন তার ঠিক নেই, তাই আগেই রূপ গৃহত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়লেন।

নিমাই যে পথে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন সেই সেই পথে তিনিও চলতে লাগলেন শুধু নিমাইয়ের দর্শনের আশায়। নিমাই প্রয়াগ-তীর্থে ফিরে এলে রূপ সেখানেই তাঁর দর্শন পেলেন।

যাবার পূর্ব্বে রূপ একখানি চিঠি লিখে গিয়েছিলেন সনাতনকে। যত সত্বর সম্ভব সংসার ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে আসবার জন্যই তিনি সনাতনকে অনুরোধ ক'রে লিখেছিলেন। সনাতনও নিমাইয়ের দর্শন-লাভের পর থেকেই বেরোবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, তবে তখনও রাজকর্ম্ম করতেন এই যা। রূপের এই চিঠি পাওয়ার পর তাঁর আর কোন কাজ করতে ইচ্ছা হ'ল না। অপার ঐশ্বর্য্য আর দেশময় সম্মানে তিনি নিতান্তই বিরক্ত হ'য়ে উঠলেন। পায়ের শিকল কি ক'রে ছিঁড়বেন এই শুধু তাঁর চিন্তা।

সনাতনের কারাবাস

আজ তিন দিন হ'ল সনাতন রাজবাড়ী যান না। নবাব এই প্রধান মন্ত্রী ছাড়া কোন কাজই করতে পারেন না। সনাতনের মত মহাবিদ্বান ও বিচক্ষণ লোকও গৌড়দেশে আর ছিলেন না। নবাব মহা-ভাবনায় প'ড়ে মন্ত্রীর খবর নিতে লোক পাঠালেন। লোক এসে দেখলে প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রচর্চ্চা কচ্ছেন; জিজ্ঞেস করলে—"মন্ত্রী মশায়, নবাবকে গিয়ে কি বলব বলুন।"

সনাতন বললেন—"বলবে আমি অসুস্থ।"

প্রধান মন্ত্রী অসুস্থ। নবাব বড়ই মুস্কিলে পড়লেন; তাঁর নিজের চিকিৎসককে ডেকে মন্ত্রীকে চিকিৎসা করতে পাঠালেন।

নবাবের কবিরাজ এলেন। দেখলেন বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা কচ্ছেন। তিনি বুঝলেন মন্ত্রী অসুস্থ নন, তাই তিনি বললেন—"মন্ত্রী মশায়, নবাব আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার চিকিৎসা করতে। আমার মনে হয় আপনি অসুস্থ নন। নবাবকে কি বলব ব'লে দিন।"

সনাতন বললেন—"আমার দেহ অসুস্থ নয় মোটেই, অসুস্থ হ'য়েছে আমার মন। এ মন নিয়ে আমি যে আর রাজকার্য্য চালাতে পারি এমন সম্ভাবনা খুবই কম। আমাকে এখন অবসর দিলেই সব চেয়ে বেশী সুখী হই।"

চিকিৎসক চ'লে গেলেন এবং নবাবকে এ কথা বললেন।

"—ঐ মোহরটা নিয়েই তুমি দেশে ফিরে যাও—" [১৬০ পৃষ্ঠা]

দু'এক দিনের মধ্যেই দায়ে প'ড়ে নবাব স্বয়ং এসে উপস্থিত হ'লেন সনাতনের বাড়ীতে। সনাতন সসম্মানে নবাবের অভ্যর্থনা করলেন।

নবাব বললেন—"মন্ত্রী, তোমার এই কয়েকদিন না যাওয়াতে সব কাজেই বিশৃঙ্খলা ঘটেছে। এখন চল, রাজসভায় গিয়ে কাজকর্ম্ম দেখ।"

সনাতন বললেন—"জাঁহাপনা, আপনি নিজে আমার বাড়ী এসে আমায় ধন্য ক'রেছেন, এ আমার বড়ই সৌভাগ্য। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমায় বলতে হচ্ছে যে, আমার মনের যা অবস্থা তাতে রাজকার্য্য পরিচালনায় আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।"

নবাব বললেন—"আমি ত তোমার ধর্ম্মকর্ম্মে কোনও দিনই বাধা দেই নি, তা তুমি কর, আর রাজকার্য্যও কর।"

সনাতন বললেন—"জাঁহাপনা, আপনি যা বললেন সবই সত্যি, কিন্তু আমি অক্ষম। দয়া ক'রে অবসর দিলেই আমি কৃতার্থ হই।"

এবার নবাব একটু বিরক্ত হ'য়ে বললেন,—"আমার রাজ্য যাচ্ছে উৎসন্ন যায় তাই তুমি চাও?"

সনাতন বললেন—"না জাঁহাপনা, অন্য একজনকে প্রধান মন্ত্রী করুন আর আমায় অবসর দিন।"

নবাব এবার চটলেন, বললেন—"তোমার ভাই কিছুদিন আগে আমায় বঞ্চনা ক'রে চ'লে গেছে। সে ক্ষতিও সহ্য ক'রেছি তুমি ছিলে ব'লে। এখন তুমিও রাজকার্য্য ছেড়ে চ'লে যেতে চাইছ। এটা কি রাজদ্রোহ নয়—এর কি শাস্তি নেই? তা ছাড়া তোমার এটাও বোঝা উচিত যে, গৌড়দেশের নবাব স্বয়ং তোমার বাড়ী এসেছেন শুধু তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। নবাবের সম্মান রক্ষার জন্যও তোমার যাওয়া উচিত।"

সনাতন বললেন—"জাঁহাপনা, আপনার নুন খেয়েছি, আপনার কাছে চিরঋণী ত আছিই। আপনি আমার মত লোকের গৃহে দয়া ক'রে এসেছেন তাতে আমি গৌরবই বোধ করি। কিন্তু রাজকার্য্যে ফিরে যেতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। আপনি দণ্ডমুণ্ডের বিধানকর্ত্তা, ইচ্ছা করলে আমায় যে কোন শাস্তি দিতে পারেন।"

নবাব গেলেন অত্যন্ত চ'টে। ফলে সনাতন হ'লেন বন্দী। তাঁকে নিয়ে রাখা হ'ল জেলখানায়। গৌড়ের নবাব যাঁর কথায় উঠতেন বসতেন, সেই সনাতন কারাগারেই বাস করতে লাগলেন। মনে একটুও দুঃখ নেই, আনন্দে তাঁর মুখ উজ্জ্বল, কারণ এতদিন পরে বিষয়-কর্ম্ম থেকে তিনি নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

এদিকে নবাব হুসেন সা উড়িষ্যায় যুদ্ধ করতে যাবেন, সঙ্গে সনাতন না থাকলে ত চলে না, অত সূক্ষ্মবুদ্ধি আর বিরাট অভিজ্ঞতা আর ত কারও নেই। নবাব তাই নিজেই জেলখানায় গিয়ে সনাতনকে সঙ্গে নেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সনাতনকে বিষয়-কর্ম্মে আর কিছুতেই রাজী করাতে পারলেন না।

সৈন্য-সামন্ত নিয়ে নবাব উড়িষ্যায় অভিযান করলেন। এদিকে ঈশান নামে সনাতনের এক অতি বিশ্বাসী চাকর রূপ গোস্বামীর এক চিঠি নিয়ে জেলের ভিতরই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। রূপ লিখেছেন—'প্রভু নিমাই নীলাচল থেকে বনপথে বৃন্দাবন যাত্রা ক'রেছেন, তাঁর চরণ দর্শনের আশায় চললুম। যত সত্বর পারেন, আপনি টাকা দিয়েও মুক্তিলাভ ক'রে আসুন। আপনার জন্য গৌড়ে—বণিকের কাছে দশ হাজার টাকা রেখে এসেছি।'

চিঠি প'ড়ে সনাতন বড়ই ব্যাকুল হ'লেন বাইরে যাওয়ার জন্য।

তাই কারাধ্যক্ষ সেখ হবুকে তিনি ধরলেন। সেখ হবু সনাতনের কাছে বহু উপকার পেয়েছিল, কিন্তু শাস্তির ভয়ে সনাতনকে গোপনে ছেড়ে দিতে রাজী হ'ল না। সনাতন বললেন—"মিঞা সাহেব, আমি আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি। আপনার কোনও ভয় নেই, নবাব গেছেন উড়িষ্যায় যুদ্ধ করতে, ফিরবেন কিনা কে জানে? যদি ফিরে আসেন আর যদি অনুসন্ধান করেন, বলবেন সনাতন গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিল, সেখানে শিকলশুদ্ধই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছে, অনেক খোঁজ ক'রেও আর তাকে পাওয়া যায় নি।"

সেখ হবু বললে—"নবাব যদি বিশ্বাস না করেন আমার যে প্রাণ যাবে, তা ছাড়া আপনাকে পাওয়া গেলেও আমার গর্দ্দান যাবে নিশ্চয়ই।"

সনাতন বললেন—"আপনার কোনও ভয় নেই মিঞা সাহেব, আমি আর এদেশে থাকব না, ফকীর হ'য়ে অনেক দূরে চ'লে যা'ব। আমি আপনাকে আরও দু' হাজার টাকা দিচ্ছি।"

সাত সাত হাজার টাকা! এর লোভ কি সেখ হবু সামলাতে পারে? ঈশানকে দিয়ে গৌড়ের বণিকের কাছে গচ্ছিত দশ হাজার টাকা থেকে সাত হাজার টাকা আনিয়ে সনাতন গণে' দিলেন। সেখ হবুও গভীর রাত্রে সনাতনকে চুপি চুপি গঙ্গা পার ক'রে দিলে।

নিমাইয়ের সন্ধানে

সনাতন চ'লেছেন পশ্চিমদিকে বনের পথে। রাজপথে চললে তাঁকে যে সকলেই চিনতে পারবে। সঙ্গে তাঁর সেই চিরবিশ্বাসী ঈশান।

চিরকাল যিনি রাজবাড়ীর মত বাড়ীতে বাস ক'রেছেন, রাজভোগ খেয়েছেন, রাজার ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রেছেন, রাজার সম্মান পেয়েছেন, তিনিই দীন হীন বেশে রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা ক'রে হেটে চ'লেছেন বনের মধ্য দিয়ে। সারাদিন চ'লে চ'লে বনের ফল-মূল যা পান তাই খেয়ে জীবন ধারণ করেন। এতেও এতটুকু দুঃখ বোধ নেই, এমনি প্রাণের টান। কে যেন চুম্বকের মত তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

এমনি ক'রে তিনি এলেন পাতড়া পর্ব্বতের গোড়ায়। এখানে ছিল এক ভূঞা। এই ভূঞাকে সনাতন অনুরোধ করলেন পর্ব্বত পার ক'রে দেওয়ার জন্য। ভূঁঞার ছিল এক গণক। কার কি আছে এই গণক ঠাকুর গণনা ক'রে দিব্যি ব'লে দিতে পারত। সে গণনা ক'রে ব'লে দিলে ঈশানের কাছে আটটি মোহর আছে। এইটি জেনেই ভূঞার হ'ল মহা আনন্দ। সে তাড়াতাড়ি সনাতনের কাছে গিয়ে বললে—"আজ রাত্তিরে দয়া ক'রে এখানেই বিশ্রাম করুন, আমি লোক দিয়ে আপনাকে পর্ব্বত পার ক'রে দেবো।" এর পর খুব উৎসাহের সহিত ভূঞা তাঁর আহারের ব্যবস্থা করলে।

নদীতে স্নান ক'রে এসে রান্না ক'রে সনাতন আহার করলেন,

কিন্তু বিশ্রাম করতে চাইলেন না। ভূঞার অত্যন্ত বেশী আগ্রহ দেখে সনাতনের বড়ই সন্দেহ হ'তে লাগল। তিনি তাড়াতাড়ি ঈশানকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—"ঈশান, তোমার কাছে টাকাকড়ি কিছু আছে নাকি?"

ঈশান বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার কাছে সাতটি মোহর আছে, পথে দরকাব হ'তে পারে মনে ক'রে এনেছি।"

সনাতন বললেন—"বেশ ক'রেছ, এখন আমার কাছে দাও।"

মোহর কয়েকটি হাতে ক'রে ভূঞার কাছে গিয়ে তিনি বললেন—"ভাই, আমার কাছে এই সাতটি মোহর আছে, নাও, আর আমাকে দয়া ক'রে পার ক'রে দাও; তোমার পুণ্য হবে।"

ভূঞা বললে—"আমি জানতে পেরেছিলুম আপনার চাকরের কাছে আটটি মোহর আছে। আপনার ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'য়েছি, তাই আপনাকে সত্যি বলছি আজ আপনাদের খুন ক'রে এই মোহরগুলো নিতুম। নরহত্যার পাপ থেকে আপনি আমায় রক্ষা ক'রেছেন। যাক, আমি আর ও মোহর নেব না, আপনাদের অমনিই পার ক'রে দিচ্ছি।"

সনাতন বললেন—"তুমি না নিলেও অন্য লোকে ত আমাদের মেরে কেড়ে নিতে পারে, তার চেয়ে তুমিই নাও, আমরাও নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাই।"

ভূঞা মোহর সাতটি নিলে এবং সনাতনের সঙ্গে চার জন লোক দিলে। রাত্রি শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই তা'রা সনাতনকে পর্ব্বত পার ক'রে দিলে।

ভূঞার লোকেরা ফিরে গেল। সনাতন ঈশানকে জিজ্ঞেস

করলেন—"তোমার কাছে কি আরও একটা মোহর আছে নাকি ঈশান?"

ঈশান বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ, পথখরচার জন্য মাত্র একটা মোহর সম্বল রেখেছি।"

সনাতন বললেন—"খুব ভাল ক'রেছ ঈশান। ঐ মোহরটি নিয়েই তুমি দেশে ফিরে যাও, আর আমার সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই।"

ঈশানের দু'চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। চোখের জল ফেলতে ফেলতেই সে বিদায় নিলে। আর তার সঙ্গে সনাতনের কোনও দিন সাক্ষাৎ হয় নি।

এবার সনাতন ছেঁড়া কাঁথা সম্বল ক'রে গভীর বনের মধ্য দিয়ে একলা চললেন বারাণসীর দিকে নিমাইকে দর্শনের আশায়।

সনাতনের শান্তি

প্রাণের আবেগে বনপথে চ'লে চ'লে সনাতন এসে উপস্থিত হ'লেন কাশীতে। এসেই জানলেন নিমাই বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসেছেন এবং তাঁরই পরমভক্ত চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে আছেন। সনাতনের আর দেরী সইল না, ছুটলেন চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে। কাউকে দেখতে না পেয়ে বাইরের দরজার পাশে ব'সে রইলেন।

এদিকে নিমাই চন্দ্রশেখরকে ডেকে বললেন—"দরজায় গিয়ে দেখ একজন বৈষ্ণব এসেছেন, তাঁকে নিয়ে এস।"

চন্দ্রশেখর এসে সনাতনকে দেখতে পেলেন বটে, কিন্তু তাঁকে বৈষ্ণব মনে করবার কোনও কারণ দেখতে পেলেন না। তাই ফিরে এসে বললেন—"কই, কোন বৈষ্ণব ত দেখলুম না।"

নিমাই জিজ্ঞেস করলেন—"দরজায় কি কেউই নেই?"

চন্দ্রশেখর বললেন—"একজন দরবেশ ব'সে আছেন।"

নিমাই বললেন—"দরবেশকেই এখানে নিয়ে এস।"

চন্দ্রশেখর যেমনি সনাতনকে নিয়ে ঢুকলেন নিমাইও অমনি উঠে এগিয়ে গেলেন তাঁকে ধরতে। "আমায় ছোঁবেন না প্রভু, আমায় ছোঁবেন না" ব'লে সনাতন থমকে দাঁড়ালেন। আর ছোবেন না! নিমাই তাঁকে ধরলেন একেবারে জড়িয়ে, তারপর নিয়ে বসালেন নিজের পাশে।

সনাতন প্রকৃত শান্তি অনুভব করলেন। সব পেছনে ফেলে তিনি সামনের যে টানে এবং যাঁর টানে ছুটে এসেছিলেন, তাঁকে এতদিনে

পেলেন এবং পাওয়ার মতই পেলেন। কি ক'রে সনাতন কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন সেই সব কাহিনী শুনে নিমাই বললেন—"তোমার ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছে প্রয়াগে, সে গেছে বৃন্দাবনে আর আমি ফিরে এসেছি কাশীতে। তাকে ব'লে দিয়েছি বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে যেতে, সেখানেই আমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হবে।"

নানান কথার পর চন্দ্রশেখরকে সনাতনের পরিচয় দিয়ে নিমাই বললেন—"সনাতনকে অন্যেও দরবেশ ব'লে মনে করতে পারে, ওকে বৈষ্ণবের বেশ ক'রে দাও।"

চন্দ্রশেখর এক নাপিত ডেকে এনে সনাতনের ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়ে আর গঙ্গাস্নান করিয়ে একখানি নতুন কাপড় পরতে দিলেন। সনাতন নতুন কাপড় নিতে কিছুতেই রাজী হ'লেন না, চাইলেন একখানি পুরাণো কাপড়। তাঁকে তা-ই দেয়া হ'ল। সনাতন কাপড়খানি দু'টুকরা ক'রে একটি কৌপীন ও একটি বহির্ব্বাস করলেন।

কাশীর পথে সনাতনের এক আত্মীয় তাঁকে একখানি কম্বল জোর ক'রে দিয়েছিলেন, সেই কম্বলখানি তখনও তাঁর গায়ে ছিল। নিমাই কম্বলখানার দিকে কয়েকবার তাকালেন।

সনাতন এইটি বেশ লক্ষ্য করলেন। দুপুরবেলা গঙ্গার তীরে চলতে চলতে সনাতন দেখলেন এক বৈষ্ণব একখানি ছেঁড়া কাঁথা শুকোতে দিয়েছেন। সনাতন আস্তে আস্তে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—"আমার এই কম্বলখানা নিয়ে আপনার ঐ কাঁথাখানা আমাকে দিন না।"

বৈষ্ণবটি বললেন—"আপনি একজন প্রবীণ লোক, আমাকে এমনি ভাবে উপহাস করা আপনার উচিত নয়।"

"আমার কম্বলখানা নিয়ে ঐ কাঁথাখানা আমায় দিন-না।" [১৬৮ পৃষ্ঠা]

সনাতন যে সত্যি কথাই বলছেন, ঠাট্টা করেন নি, এইটি যখন বৈষ্ণব বুঝলেন তখন তিনি কাঁথাখানি বদল করতে রাজী হ'লেন। সনাতন কাঁথা গায়ে দিয়ে এলেন।

নিমাই জিজ্ঞেস করলেন—"তোমার কম্বল গেল কোথায় সনাতন ?"

সনাতন সব বললেন।

নিমাই বললেন—"ভগবান তোমাকে সবই ছাড়িয়েছেন, ঐশ্বর্য্যের শেষ চিহ্ন কম্বলই বা রাখবেন কেন ? কৌপীন প'রে একখানি দামী কম্বল গায়ে দিয়ে ভিক্ষে করতে গেলে লোকেও হাসত। এ বেশ হ'য়েছে।"

সনাতন এবার সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করলেন আর রূপ ত পূর্বেই ক'রেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের শাস্ত্রীয় ভিত্তি সনাতন আর রূপই প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রণয়ন করাই নয়, লুপ্ততীর্থের উদ্ধার এবং বহু গ্রন্থ রচনা ক'রে রূপ-সনাতন অমরত্ব লাভ ক'রেছেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে এঁদের দানের তুলনা নেই, আর এই বৈষ্ণব-সাহিত্যের কাছে বাংলা-সাহিত্যও অশেষ প্রকারে ঋণী। এই দুই মহাপুরুষের দ্বারা এত বড় কাজ হ'তে পারবে বুঝতে পেরেই মহাপ্রভু নিমাই তাঁদের ঘরছাড়া ক'রে টেনে এনেছিলেন।

নিমাই আবার নীলাচলে

বৃন্দাবন থেকে নিমাই নীলাচলে ফিরে এসেছেন। নীলাচলে অগণিত ভক্তের সমাগম হ'ল। গৌড়দেশ থেকেও শত শত ভক্ত হরিধ্বনি করতে করতে নীলাচল যাত্রা করলেন। এতদিন পর নিমাইয়ের খবর পেয়ে শচীদেবীরও একটু আনন্দ হ'ল।

এদিকে রূপ বৃন্দাবন থেকে বারাণসীতে এলেন, কিন্তু সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল না, সনাতন তখন বৃন্দাবন যাত্রা ক'রেছেন। রূপ বারাণসী থেকে গৌড়ে এসে কিছুদিন থেকে নীলাচলে গেলেন। নিমাই ভক্তদের কাছে রূপের বিশেষ পরিচয় দিলেন।

রূপ গোস্বামী হরিদাস ঠাকুরের বাসার পাশেই বাসা নিয়েছিলেন। রূপ যেমন ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সাধক তেমনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ কবি। নিমাই মাঝে মাঝে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মত প্রবীণ পণ্ডিত ও ভক্তদের নিয়ে তাঁর কুটীরে পদার্পণ করতেন।

একদিন রূপ গোস্বামী বই লিখছেন। নিমাই গিয়ে তখন উপস্থিত। রূপ তাড়াতাড়ি উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে নিমাইকে বসালেন।

নিমাই জিজ্ঞেস করলেন—"কি বই লিখছ রূপ?" ব'লেই ওপরের পাতাখানি তুলে নিলেন। রূপের হাতের লেখা ছিল একেবারে মুক্তার মত। তা দেখে নিমাই বললেন—"কী সুন্দরই তোমার হস্তাক্ষর।" এই ব'লেই তিনি একটি শ্লোক পাঠ করলেন। শ্লোকটিতে কৃষ্ণ-কথা এমনভাবে লেখা হ'য়েছে যে, নিমাই প্রেমের আবেশে মূর্চ্ছিত হ'লেন। হরিদাস ঠাকুর ত শ্লোকটি শুনে আনন্দে নৃত্য সুরু ক'রে দিলেন।

নিমাই আবার নীলাচলে

কিছুদিন পর নিমাই বললেন—"রূপ, তুমি বৃন্দাবনে গিয়ে ভক্তিশাস্ত্র প্রচার কর, আর সনাতনকে নীলাচলে পাঠিয়ে দাও।"

লুপ্ততীর্থের উদ্ধার আর ভক্তিশাস্ত্রের প্রচারের উদ্দেশে রূপ বৃন্দাবন যাত্রা করলেন।

এদিকে সনাতনও বৃন্দাবন থেকে একাকী বনের পথে যাত্রা ক'রেছেন নীলাচলের দিকে। রোদে, বৃষ্টিতে, অনাহারে, অনিদ্রায় দিনের পর দিন কাটিয়ে তাঁর গায়ে হ'ল ভয়ানক খোস। এক গা খোস ও ঘা নিয়ে তিনি নীলাচলে এসে প্রথমেই গেলেন হরিদাসের আশ্রমে, নিমাইকে দর্শন করতে গেলেন না। একটু পরে নিমাই স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হ'লেন। সনাতনকে দেখেই তিনি এগিয়ে গেলেন তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করতে। "ছোঁবেন না, ছোঁবেন না" ক'রে সনাতন পেছিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু পেরে উঠলেন না, তাঁর গায়ের খোস আর ঘায়ের পূজ লেগে গেল নিমাইয়ের সারা গায়।

নিমাইয়ের ইচ্ছায় প্রায় এক বছর নীলাচলে থেকে নিমাইয়েরই আদেশে সনাতন বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে রূপ ও সনাতন দু' ভাই একদিকে লুপ্ততীর্থের উদ্ধার, অন্যদিকে ভক্তিগ্রন্থ সকলের প্রচার করতে লাগলেন।

এদিকে নানাদিক থেকে ভক্তরা এসে ক্রমে ক্রমে নীলাচলেই বাস করতে আরম্ভ করলেন। বাঙালী, মাদ্রাজী, মারাঠী, উৎকলী, হিন্দুস্থানী ভক্তরা নীলাচলে থেকেই নিমাইয়ের উপদেশ লাভ ও কথামৃত পানে বিভোর হ'য়ে জীবনের পথের সন্ধান পেলেন।

হরিদাসের নির্ব্বাণ

নিমাইয়ের এক পরমভক্ত গোবিন্দ প্রসাদ নিয়ে গেছেন হরিদাসের কাছে। হরিদাস প্রসাদের অন্ন গ্রহণ ক'রেই জীবন ধারণ করতেন। গিয়ে দেখেন হরিদাস শুয়ে আছেন আর খুব ধীরে ধীরে হরিনাম কচ্ছেন।

গোবিন্দ বললেন—"ঠাকুর ওঠ, প্রসাদ নাও।"

হরিদাস বললেন—"আমার নামের সংখ্যা এখনও পূরণ হয় নি, কাজেই আজ আর প্রসাদ গ্রহণ করব না, তবে যখন এনেছ এক কণা দিয়ে যাও।"

হরিদাস কণামাত্র প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

পরদিন নিমাই নিজেই এসে জিজ্ঞেস করলেন—"হরিদাস, তোমার ত অসুখ হ'য়েছিল, কেমন আছ?"

হরিদাস বললেন—"প্রভু, শরীর আমার অসুস্থ নয়, মন ভারি অসুস্থ, হরিনামের সংখ্যা পূরণ করতে পাচ্ছি না।"

নিমাই বললেন—"তুমি বুড়ো হ'য়ে গেছ, সংখ্যাটা কমাও।"

হরিদাস বললেন—"সংখ্যা ত কমই হচ্ছে। প্রভু, তোমার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। আমি অতি হীন, তুমিই আমায় হাত ধ'রে তুলেছ, আমাকে কোল দিয়ে ধন্য ক'রেছ, তুমিই ঈশ্বর। সুতরাং ইচ্ছাময়, আমার একটা আকাঙ্ক্ষা তুমি পূর্ণ কর। আমি এখন তোমার ঐ শ্রীচরণে দৃষ্টি রেখেই দেহ ত্যাগ করতে চাই।"

সনাতনকে দেখেই তিনি এগিয়ে গেলেন কোলাকুলি করতে [১৭১ পৃষ্ঠা

নিমাই বললেন—"তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে, এটা কি তোমার উচিত কাজ ?"

হরিদাস বললেন—"আমায় আর ছলনা ক'রো না প্রভু, আমার আশা যেন পূর্ণ হয়। কাল দুপুরবেলা এসে এই অধমকে একবার দর্শন দিও প্রভু।"

পরদিন দুপুরবেলা নিমাই ভক্তগণ নিয়ে হরিদাস ঠাকুরের কাছে গেলেন। হরিদাস প্রভুর চরণ বন্দনা ক'রে তাঁর ভক্তদের পদধূলি গ্রহণ করলেন।

নিমাই বললেন—"হরিদাস, কি খবর ?"

হরিদাস বললেন—"প্রভু, তোমার দয়া ছাড়া আর কোন খবর আমার নেই। আমার সামনে ব'স প্রভু।"

নিমাই তাঁর সামনে বসলেন। সকলে মিলে নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন, আর হরিদাস তাঁর প্রভুর চরণে চোখ রেখে হরিনাম করতে করতে দেহত্যাগ করলেন।

প্রেমের আবেশে হরিদাসের দেহ নিয়ে নিমাই নৃত্য করলেন। তারপর সকলে কীর্ত্তন করতে করতে তাঁর দেহ নিয়ে গেলেন সমুদ্রের তীরে।

ভাবের আবেশ

প্রতি বছরই রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে এসে নিমাইয়ের সঙ্গ-সুখ লাভ ক'রে কৃতার্থ হ'তেন। এবারও তাঁরা এসেছেন। আবার,

"চক্রনেমির ঘর্ঘর রবে নির্ঘোষি রাজপথ,
বিশ্ব কাঁপায়ে চ'লেছে রে আজ বিশ্বরাজের রথ।"

নিমাই এবারও দলে দলে ভক্ত নিয়ে রথের সামনে কীর্ত্তনের সঙ্গে নৃত্য করতে করতে চ'লেছেন। লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ। সেই অগণিত জনসঙ্ঘের সমবেত 'হরিবোল' শব্দে আকাশ-বাতাস কম্পিত, নীলাচল টলমল।

রথ-যাত্রা শেষ হ'য়ে গেল। নিমাইয়ের ভাবাবেশ আগের চেয়েও বেড়ে গেল। বাহ্যজ্ঞান তাঁর খুব কমই ফিরে আসে। প্রায় সব সময়ই ভাবে বিভোর হ'য়ে থাকেন।

একদিন তিনি যাচ্ছিলেন যমেশ্বর টোটায়। সঙ্গে গোবিন্দ। যেতে যেতে শুনতে পেলেন কে যেন অতি মিষ্টি সুরে "গীত গোবিন্দের" একটি শ্লোক গান কচ্ছে। সেই সুমধুর সঙ্গীত তাঁর 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল' 'আর তাঁর প্রাণও 'আকুল করিল'। দূর থেকে শুনেই তিনি প্রেমে আবিষ্ট হ'লেন। গান কচ্ছিল এক দেবদাসী। পুরুষ কি স্ত্রীলোক গান কচ্ছে সে বোধ তখন তাঁর নেই। তাই তিনি তার কাছে যাওয়ার জন্য ছুটলেন ঊর্দ্ধশ্বাসে কাঁটাবনের ভিতর দিয়েই।

শিজের কাঁটায় তাঁর সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে গেছে, ঝর ঝর ক'রে রক্ত পড়ছে। মন ভাবে এমনই আবিষ্ট হ'য়ে আছে যে, তিনি তা টেরও পেলেন না। তাঁকে দৌড় দিতে দেখে গোবিন্দও তাঁর পিছনে পিছনে ছুটলেন; ছুটতে ছুটতে গিয়ে নিমাইকে ধ'রে বললেন—"প্রভু, যে গান কচ্ছে সে স্ত্রীলোক।"

স্ত্রীলোক! শুনেই তাঁর বিহ্বলতা একটু ক'মে গেল। তিনি বললেন—"গোবিন্দ, তুমিই আজ আমার প্রাণ রক্ষা করলে। স্ত্রীলোক স্পর্শ করলে আমার মরণ হ'ত। তোমার কাছে আমি চিরঋণী রইলুম।"

গোবিন্দ বললেন—"আমি কিছুই করি নি, রক্ষা ক'রেছেন জগন্নাথ।"

নিমাই বললেন—"তুমি সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থেকো গোবিন্দ, সব সময়েই আমায় এমনি সতর্ক ক'রে দেবে।"

খবরটা শুনে স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তদের ভারি ভয় হ'ল।

গৌড়ের ভক্তগণ রথযাত্রা দর্শন ক'রে ফিরে গেলেন। তাঁদের যাওয়ার পর তিনি সম্পূর্ণ আবিষ্ট হ'য়ে পড়লেন।

অন্তর্দ্ধান

নিমাইয়ের আবেশ আর প্রায়ই ভাঙে না। ভক্তদের ভারি ভয় হ'ল। যাঁর প্রেমধর্ম্ম ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত কোটি কোটি মানুষের মনে প্রবল দোলা দিয়েছে, যাঁর শিক্ষা ও বাণী অগণিত মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে এসেছে, পাপী-তাপীকে উদ্ধার ক'রেছে, ধর্ম্মের গ্লানি আর অধর্ম্মের উত্থান বিনষ্ট করবার জন্যই যিনি অবতীর্ণ, তাঁকে পাছে হারাতে হয়, এইটি ভেবেই ভক্তরা মহাচিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। স্বরূপ আচার্য্য, গোবিন্দ প্রভৃতি ভক্তরা সমস্ত রাত্রিই তাঁর কাছে থাকেন।

একদিন রাত দুপুরের পর নিমাই শুয়েছেন। স্বরূপ আর গোবিন্দ দরজায় শুয়ে আছেন। নিমাইয়ের চোখে ঘুম নেই, কৃষ্ণনাম কচ্ছেন। খানিক পরে তাঁদের সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা ঘরে ঢুকে দেখলেন নিমাই নেই। তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে তাঁরা খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেল ফটকের পাশে অজ্ঞান হ'য়ে নিমাই প'ড়ে আছেন। অনেকক্ষণ হরিনাম করবার পর তাঁর চৈতন্য হ'ল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"আমি এখানে কেন?"

স্বরূপ বললেন—"প্রভু, বাসায় চলুন, সেখানেই সব বলব।" তাঁকে বাসায় নিয়ে গিয়ে স্বরূপ সব বললেন। নিমাই বললেন—"কই, আমার ত কিছুই মনে পড়ছে না? আমি চারদিকে শ্রীকৃষ্ণকেই দেখছি, কিন্তু ধরতে পাচ্ছি না; এক একবার দেখা দিয়ে আবার লুকোচ্ছেন।"

আর একদিন নিমাই চ'লেছেন সমুদ্রের ধার দিয়ে। যেতে যেতে দেখতে পেলেন চটক পাহাড়। নিমাই মনে করলেন বৃন্দাবনের গিরি-গোবর্দ্ধন। অমনি ছুটলেন সেই দিকে। গোবিন্দ পেছনে ছিলেন, তিনিও চীৎকার ক'রে ছুটলেন। গোবিন্দের চীৎকার শুনে স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তরাও উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলেন। ইতিমধ্যে নিমাই মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন। ভক্তরা এসে আর কোন উপায় না দেখে কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। নিমাইয়ের সংজ্ঞালাভ হ'ল, স্বরূপের দিকে চেয়ে তিনি বললেন—"গোবর্দ্ধনের কাছে গিয়ে দেখলুম কৃষ্ণ গোচারণ কচ্ছেন, করতে করতেই গোবর্দ্ধনের চূড়ায় উঠে বাঁশী বাজালেন। হায় হায়! তোমরা আমায় ধ'রে নিয়ে এলে, আমায় আর দেখতেও দিলে না—শুনতেও দিলে না।"

নিমাই কাঁদতে লাগলেন। এমনি ক'রেই দিনের পর দিন কাটতে লাগল।

শরৎকালের রাত্রিতে চাঁদের আলোকে নিমাই ভক্তদের নিয়ে নীলাচলের ফুলের বাগানে বিভোর হ'য়ে কীর্ত্তন ও নৃত্য করতেন। একদিন স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তরা একটু দূরে র'য়েছেন। চাঁদের আলো সমুদ্রের বুকে এসে প'ড়েছে, নিমাই সমুদ্রের নীল জল দেখেই যমুনা মনে ক'রে দিলেন দৌড়, আর এক দৌড়ে গিয়েই ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন সমুদ্রের বুকে।

নিমাই সমুদ্রে ঝাঁপ দেবেন, এটা কোন ভক্তই কল্পনাও করতে পারেন নি। তাঁরা তাঁকে দেখতে না পেয়েই এদিকে সেদিকে খুঁজতে আরম্ভ করলেন। এমন সময়ে তাঁরা দেখলেন এক জেলে জাল কাঁধে ক'রে তাঁদের দিকেই আসছে। জেলেকে জিজ্ঞেস

করলেন—"তুমি যে পথে এলে সে পথে কোন মানুষকে যেতে দেখেছ ?"

জেলে উত্তর দিলে—"কোন মানুষ যেতে দেখি নি, তবে একটি মরা মানুষ সমুদ্রের ধারে ফেলে এসেছি।"

—"সে কি—সে কি ?"

জেলে বললে—"আমরা রাত্তিরে মাছ ধ'রে বেড়াই; আজ জাল টানলুম, মাছ উঠল না, উঠল একটা মরা মানুষ। কী আর করি, সমুদ্রের তীরেই ফেলে এসেছি।"

শঙ্কিত চিত্তে সবাই সেখানে ছুটে গিয়ে দেখলেন যে 'মরামানুষ' আর কেউ নন, তিনি নিমাই।

এর পর ভক্তরা আরও সতর্ক হ'লেন।

একদিন নাম-কীর্ত্তনের পর খুব বেশী রাত্রে নিমাই শয়ন করলেন। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দরজার বাইরে স্বরূপ আর গোবিন্দ শুয়ে

একটু পরেই ঘরের মধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ হ'ল। লাফিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বেলেই তাঁরা ঘরের ভিতরে গেলেন। গিয়েই দেখলেন—নিমাই মাটিতে প'ড়ে আছেন, তাঁর মুখের কয়েক জায়গা কেটে গেছে, আর মুখ থেকে রক্ত পড়ছে। ছু'জনে তাঁকে আবার বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

স্বরূপ জিজ্ঞেস করলেন—"প্রভু, আপনার মুখ কেটে গেল কি ক'রে ?"

নিমাই বললেন—"নাম করতে করতে আমার মন কেমন অস্থির হ'ল, বাইরে যেতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু দরজা আর খুঁজে পেলুম না। তার পর যে কি হ'য়েছে জানি নে।"

অন্তর্দ্ধান

নিমাই যাতে আর বিছানা ছেড়ে যেতে না পারেন ভক্তগণ তার ব্যবস্থা করলেন। পর দিন শঙ্কর পণ্ডিত নামে এক ভক্ত নিমাইয়ের পা বুকে জড়িয়ে ধ'রে শুয়ে রইলেন। এই ভাবে কাটল আরও কয়েকদিন।

তারপর একদিন নিমাই খুব ভোরে উঠে জগন্নাথ দর্শন করতে গেলেন। রোজই যেতেন, কাজেই ভক্তদেরও মনে এতে কোন ভয় ছিল না; কিন্তু এবার যে গেলেন আর ফিরলেন না, আর তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল না।

সমাপ্ত